ডুয়ার্সে খ্রিস্টধর্মের জনপ্রিয়তা আজও কল্যাণের পথেই

ইকো টুরিজম আবার দুরাচারীদের মুখোশ হয়ে দাঁড়াবে না তো!

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন মানাবাড়ি ও পাথরঝোরা

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭। ১২ টাকা

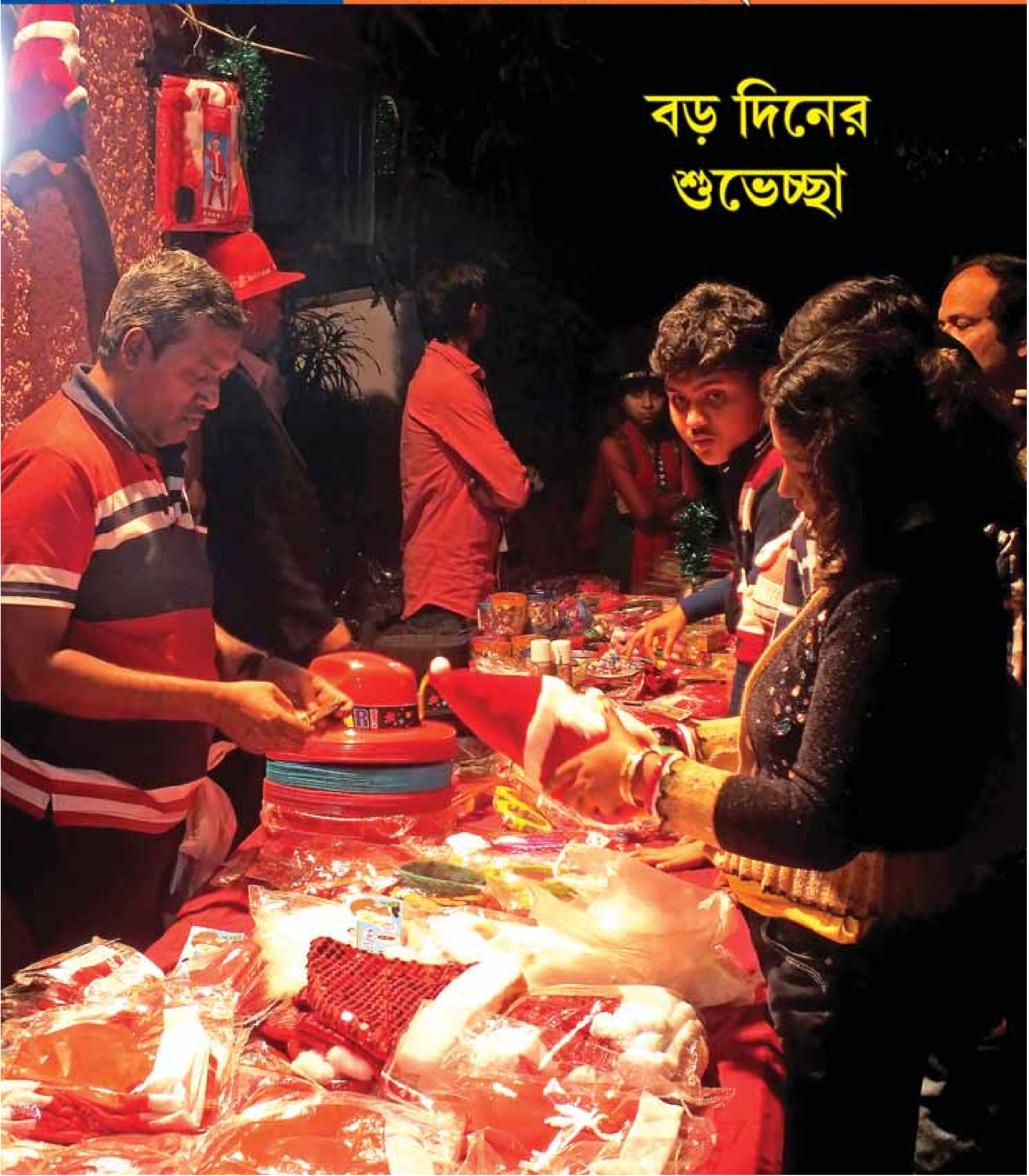

ayurveda
The Science Of Life
Divyaur®
PHARMAKRAFT®
Crafting Wellness
Launching
Ayurvedic Range of Products
200 ml.
Green Liver™
AYURVEDIC RESTORATIVE LIVER TONIC
Kesh Mitra™
Ayurvedic Hair Oil
केश मित्रा
100 ml
Cough Mitra™
100 ml
Herbal COUGH REMEDY
Sahi Aakar™
Breast Enlargement Oil
Orthomitra™
Oil
Herbal Pain Relief Oil
25% EXTRA
50% EXTRA
Tulsi 5in1
Kamamitra™
Roop Mitra™
Herbal Face Cream
Divyaur® (A Division of PHARMAKRAFT®)
PHARMAKRAFT THERAPEUTICS PVT. LTD.
For Distributorship Please Call : 8697773093 (10.30 am to 6 pm)

এখন ডুয়ার্স-এর নতুন বই

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো

সা গ রি কা রা য়

এক মায়াময় জগত ডুয়ার্স, যার সঙ্গে লেখিকার নাড়ীর বন্ধন। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চেতনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের নানা চিত্রকল্প। কলকাতার একটি বড় দৈনিকের রবিবারের পাতায় একসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া চৌত্রিশটি গল্পের সংকলন। প্রকাশিত হল। **দাম ১৫০ টাকা।**

বইমেলার মরশুমে আরও প্রকাশিত হচ্ছে

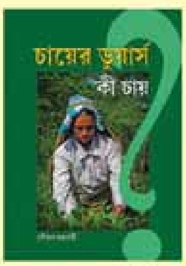

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?

গৌতম চক্রবর্তী

গত এক বছরে ডুয়ার্সের চা-শিল্পের পরিস্থিতি, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, সরেজমিনে বাগান ধরে ধরে ঘুরে দেখে তা ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়। অবনতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি যেমন ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে চায়ের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠছে যে বিশাল মাফিয়া চক্র, তারও ইঙ্গিত মিলেছে বহু জায়গায়। এই সংকলনে ধরা পড়েছে এক অবিশ্বাস্য যুগ। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এই বইটি সাড়া জাগাবে কোনও সন্দেহ নেই। **১১০ টাকা**

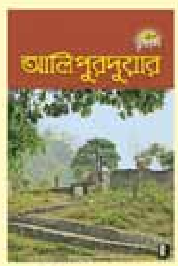

আলিপুরদুয়ার

সংকলন

রাজ্যের এই নবীন জেলাটি ইকো পর্যটন তথা অরণ্য সম্পদের একটি খনি বলা যায় নিঃসন্দেহে। কোনও প্রকৃতিপ্রেমী বা কোনও ইকো পর্যটকের জন্য এই জেলা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও ভাষায় কোনও প্রামাণ্য গাইড বই বেরোয়নি। আলিপুরদুয়ারের প্রাচীন জনজাতি বা লোক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য কিন্তু বিশাল। সাধারণ পর্যটক যাঁরা আজ উৎসুক হয়ে আলিপুরদুয়ারে আসছেন, তাঁদের জন্য দু'মলাটে বন্দি তথ্য সমৃদ্ধ কোনও বই নেই। বিশিষ্ট লেখকদের বিষয়ভিত্তিক রচনা নিয়ে এই সংকলন এর আগে হয়নি। **২০০ টাকা**

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

রাজনীতির চর্চার পটভূমি একদিন বদলে গেল। পরিস্থিতির চক্রে ডুয়ার্স থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। সঞ্জয় গান্ধী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, তারপর রাজীব গান্ধীর বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলের হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কাটাবার অভিজ্ঞতা হল, পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়ার সুযোগও। দীর্ঘ ২৬ বছরের উত্তরবাংলা, কলকাতা হয়ে দিল্লি তথা গোটা দেশের রাজনীতির ছবি ধরা পড়েছে জনপ্রিয় নেতার কলমে। **১৫০ টাকা**

পাওয়া যাচ্ছে: কলকাতা - দেজ পাবলিশিং ও অক্সফোর্ড। জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড

আলিপুরদুয়ার বইমেলা ২০-২৬ ডিসেম্বর, মালবাজার বই মেলা ২৭ ডিসেম্বর-২ জানুয়ারি

Adventure Sports first time ever at any eco-resort in Dooars

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;

Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9474904461, 9002722699

Mystic Murti mesmerises over Gorumara where luxury meets excitement

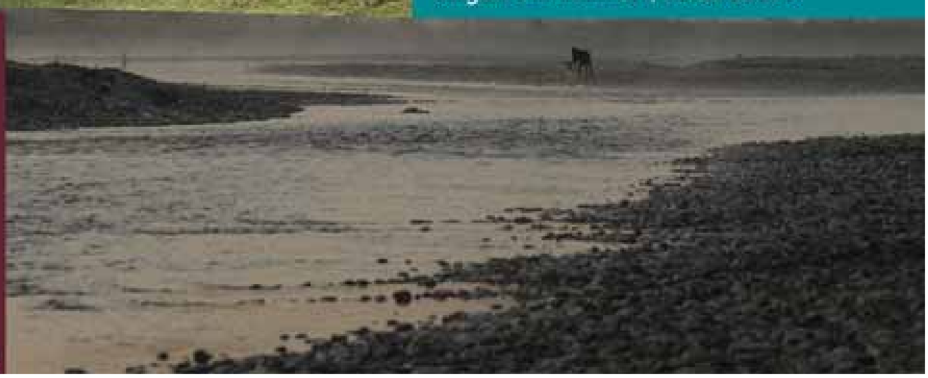

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

রাজবাড়ির দিঘি এখন জলপাইগুড়ির বিশেষ স্থানগুলোর মধ্যে একটি। এটির সৌন্দর্য্যায়নের ফলে বহু মানুষ আসছেন একটু মুক্ত পরিবেশে শ্বাস নেওয়ার জন্য। জলপাইগুড়ির শহরের মানুষও যেমন ভিড় করেন এখানে তেমনই যেসব পর্যটকরা আসছেন বাইরে থেকে তাঁদের জন্যও এটি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। নোংরা আবর্জনায় মৃতপ্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যময় দিঘিটিকে সংস্কার করার ফলে যেন নতুন করে অক্সিজেনের যোগান ঘটেছে শহরের ফুসফুসে। তেমনই রাজবাড়ির দিঘি একঘেয়ে নাগরিক জীবনে নিয়ে এসেছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

সম্পাদকের ডুয়ার্স

অনুশাসন নেই প্রতিরোধ নেই তাই লুট চলবে! বুড়ো আঙুল চুষবে উত্তরের মানুষ?

খবরে প্রকাশ, দার্জিলিং পাহাড়ের কমলালেবু এবার শিলিগুড়ি অবধি আর পৌঁছাতে পারছে না, কারণ বাইরের বড় বড় ব্যাপারীরা নাকি এবার সব আটঘাট বেঁধেই এসেছে। পাহাড় থেকেই সরাসরি মাল কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই শিলিগুড়ির নাকের ডগা দিয়েই, হাঁ করে বসে সেসব দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। একে এবারের লেবুর ফলন কম, আগাম টাকা দিয়ে গাছ বুক করা মহাজনদের মাথায় হাত, তার ওপর দার্জিলিঙের বিখ্যাত লেবুর বরাত হাতছাড়া হওয়াটা, বলাই বাহুল্য, সুখশ্রাব্য হয় না কোনওভাবেই। অগত্যা সেই ভুটানি লেবুই ভরসা। ফলন নেই, দার্জিলিং নেই, বাজারের চাহিদার চাপে ভুটানের কাঁচা লেবুই গাছ থেকে চলে আসছে বাজারে। মধ্যবিত্ত মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে বিকেলের রোদ পোহাতে পোহাতে এক কোয়া মুখে দিয়েছে কি দেয়নি, বিষ টকে দাঁত মাড়িশুদ্ধ অসাড়।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বিষয়টিকে একটু অন্য চোখে বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন। এর মধ্যে অন্য কোনও গূঢ় চক্রান্ত আছে কি নেই তা বলা কঠিন, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল নিজেদের সম্পদ লুট হয়ে খালি হয়ে গেলেও আমাদের সেদিকে অসহায় তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর বোধহয় বিকল্প কিছু নেই! আজ বাইরে থেকে এসে পাহাড়ের লেবু সাবড়ে নিয়ে যাচ্ছে, উত্তরের নিজস্ব ফলন-শিল্প এখানকার মানুষের হিতে লাগছে না, কাল যে এখানকার অন্যান্য সম্পদও একইভাবে বাইরে চলে যাবে না তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে আদৌ? উত্তরের অরণ্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সাংস্কৃতিক সম্পদ সব একে একে এভাবেই হাতের বাইরে চলে যাবে আমাদের? কোনও নিয়ন্ত্রণই থাকবে না সেসবের উপর? কোনও প্রতিরোধ হবে না কোথাও?

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তবে পাহাড়ের কোণে কোণে ইকো টুরিজমের উন্মেষ সমস্যাদীর্ণ, অভিমানী পাহাড়ের ক্রোধ উপশমে আদপেই কোনও কাজে লাগছে কি? ইকো পর্যটনের ধ্বজা নিয়ে যারা আমাদের পাহাড়ে দাপটে সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসে আছে তারা নিজেদের ঐতিহ্যময় সম্পদ সংরক্ষণে কতটা সময় ব্যয় করছে? পাহাড় জঙ্গলের প্রাচীন জনজাতির মানুষগুলিকে কতটা নিজেদের অধিকার নিয়ে সচেতন উদ্বুদ্ধ করতে সম্ভব হয়েছে তারা? বিহ্বল পর্যটককে হাত ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা কিংবা কমলা বাগান চেনাতে গিয়ে তাদের বলতে কি শোনা যায়, ওই হিমাল এই বাগান সব হামাদের নিজেদের আছে! নাকি পুরোটাই ভাঁওতাবাজির খেলা? যার আসল উদ্দেশ্য যত দ্রুত সম্ভব সাবড়ে নিয়ে কেটে পড়া?

মুশকিলটা হল, উত্তরের সমস্যা সমাধানে কোনও কালে কেউই বেশি গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেনি! যেটুকু রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা হয়েছে বারবার, অনুশাসনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কখনওই। সাস্টেনেবল টুরিজম-এর বছরভর আন্তর্জাতিক উদ্‌যাপন শেষে সর্বস্তরে সেই একটাই অনুভূতি রয়ে গেল, প্রকৃতিকে অবিকল রেখে টুরিজম চালাতে গেলে প্রয়োজন নিয়মকানুন মেনে চলা, যা আমাদের বাংলায় এখনও অনুপস্থিত। এর ফল অনুমান করা খুব সহজ, এখানকার জঙ্গল থেকে একে একে দুষ্প্রাপ্য পশুপাখির আওয়াজ, দুর্মূল্য ভু-সম্পদ ক্ষীণ হতে হতে শিগগিরি হীন বা লীন হয়ে যাবে।

গত কয়েক বছরে রাজ্য জুড়ে একটা প্রবাদ বেশ চালু হয়েছে, এই বাংলায় যার কেউ নেই তার দিদি আছেন। দিদি, আমাদের এই উত্তরের মানুষগুলির মন ওই কমলালেবুর কোয়ার মতোই নরম, একে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যে চাই বজ্র কঠিন বর্ম!

চতুর্থ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা,
১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ১০

বড়দিনের ডুয়ার্স— খ্রিস্টধর্মের জনপ্রিয়তা কল্যাণ পথেই ১৬

ইকো টুরজম আবার শোষণের নয়া মুখোশ হয়ে না দাঁড়ায়! ২০

পর্যটন: আকাশিয়া ২৫

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

তরাই উৎরাই ৩২

শালবনে রক্তের দাগ ৩৪

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৯

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৮

ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪২

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৪

শ্রীমতী ডুয়ার্স

নারী নির্যাতন বন্ধ হবে তারা সংগঠিত হলে ২৮

ডুয়ার্সের ডিশ ২৮

অপর্ণার দিনরাত্রি ৩১

টুকিটাকি

ডুয়ার্স উৎসব ৪৫

আলিপুরদুয়ার চিনুন

শৌভনিকদের চোখে ৪৬

প্রচ্ছদ ছবি: অনুভব দে

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

কে ডাকে তাকে

এই জন্যি বলি বাপ শনিবারের বারবেলায় কোথাও যাস নে! শুনলে তো! তা শুনবেই বা কেন? নাম যার ঘাড়মোটা সে কি আবার শোনে কথা? সেই যে শনিবার বারবেলায় গরুমারা ছেড়ে লাটাগুড়ি জঙ্গলের পথে বিবাগী হলি, আর ফিরলি না! জোড়া কুনকি পাঠিয়েও ফিরিয়ে আনা গেল না গো জীবটাকে। জোর করে ফিরিয়ে আনার জন্য আরো কুনকি পাঠাবে বলে ভাবলেও শেষে কর্তারা ঠিক করেছেন, জোরাজুরি নয়। বনের ছেলে ইচ্ছে হলে নিজেই ফিরে আসবে। এত এত টুরিস্ট বেড়াতে আসছে কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে— দেখে ঘাড়মোটারও কি ইচ্ছে হয় না বনান্তরে যেতে। আগেও তো কত্তবার গরুমারা ছেড়ে লাটাগুড়ি গেছে সে। ফিরে কি আসে নি? কিন্তু গন্ডারের ছেলে মাঝে মাঝেই লাটাগুড়ি চলে যায় কেন? কেউ আছে নাকি? 'কেহ কি ডাকিছে তারে ওধারে ঘাসবন হতে?'

ব্যাক্রাইম

ওরে চাচা! আবার আসছে রে! তাঁকে দেখেই থানার লোকজন কেউ শীতকালে ফ্যান চালিয়ে দিচ্ছে, কেউ রাইফেলের দৈর্ঘ্য মাপতে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি অভিযোগ করেই ছাড়বেন। এক ভয়ানক ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে রোজ অভিযোগ জানাতে আসেন তিনি। মিঞা সাহেব। পড়শী আরেক মিঞা সাহেবের চারপেয়ে ব্যাবাবুর বিরুদ্ধে ফি রোজ একখানা করে ডায়েরি না লেখালেই নয়। রোজ রোজ বাগানের পুঁইশাক থেকে শুরু করে ক্ষেতের ফুলকপি-হাফকপি, রান্নাঘরের চিঁড়ে ভাজা মায় মাঠের ধান খেয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন অথচ পুলিশ কিছু করছে না কো! কিন্তু পুলিশই বা করবে কী? ব্যাবাবুর অভিভাবক তো অভিযোগ মানতেই চান না। বলেন, আমার ছাগলের মত শিক্ষিত, ভদ্র, শান্ত ছাগল গেরামে দুটো আছে নাকি? চুরি করছে বললেই হলো! ফলে পুলিশের ভারি অশান্তি। হাতে নাতে না ধরলে তো ছাগলকে ক্রিমিনাল বলা যায় না। আর, জেরা করে ছাগলের মুখ থেকে কথা বের করার কথা কেউ শুনেছে? নকশালবাড়ির কোতয়ালরা তাই ভারি সমস্যায় 'ব্যাআদপ' ছাগুর জন্য।

ভাবার বিষয়

শেষে কি হাতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাঠপাচার হচ্ছে গো! শোনো নি পাখড়িগুড়ির কাহিনি? সেখান থেকে সাতাশ পা হাঁটলেই আসাম। আর সেই আসাম থেকে অসাম কোয়ালিটির কাঠ হেলতে দুলতে এ রাজ্যে নিয়ে আসছে কাষ্ঠ ক্রিমিন্যালরা। চাইলে সেখানে গিয়ে আপনিও কিনতে পারেন আসামের অসম কাষ্ঠ। টুকরো থেকে লগ, কল চেরাই থেকে হাত চেরাই— সব রকম কাষ্ঠ রেডি। তা বাপু কাষ্ঠ ক্রাইম আটকানর জন্য বনরক্ষীরা নেই? আরে মামা, সেখানেই তো রহস্য! রক্ষীরা ফন্দি এঁটে যেই কাষ্ঠাপরাধীদের ধরতে যায় ওমনি নাকি হাতির দল হানা দেয় লোকালয়ে। রক্ষী তো সাকুল্যে কয়েকটাই। ফলে কাঠ ফেলে মাঠের দিকে ছোটে হাতি সামলাতে। দেখে শুনে তাই মনে হচ্ছে হাতিদের সঙ্গে কাষ্ঠাপরাধীদের চুক্তি হয়েছে সেখানে। ফলে চোরাই কাষ্ঠ প্রসঙ্গে কাষ্ঠ হাসি উপহার দেওয়া ছাড়া রক্ষীদের কিছু করার নেই। ভাবার বিষয়! শেষে হাতিরাও! ওএমজি!!

ক্রান্তির জল

ক্রান্তির গেরস্তের জন্য পানীয় জল পাম্প হাউজ থেকে রওনা দিচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু গেরস্তের কলসী পর্যন্ত পৌঁছোতে পারছে না। পারবে কী করে? পাইপ পথে যেতে যেতে জল দেখে বেরিয়ে যাওয়ার কত্ত রাস্তা। অমনি হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ে। খানিকটা জল কল অব্দি গিয়ে দেখে ট্যাপ নেই। ব্যস! মহাফুর্তিতে ঝর ঝর করে পড়ে ছুট লাগায় নর্দমাপানে। জলের পাইপ মেরামত করলেও ফাটে। ট্যাপ বার বার লাগালেও ভ্যানিশ হয়ে যায়। ফলে জলদের ভারি মজা। নিয়মমতো তাদের কর্তব্য হলো নল-কল বেয়ে গেরস্তের কলসীতে প্রবেশ এবং পরিশেষে হিসু হয়ে ধরার উদ্দেশ্যে প্রস্থান। কিন্তু ফাটা নল আর কাটা কলের জন্য জলেদের অত কাজ করতে হচ্ছে না কো ক্রান্তিতে। তবে অল্প কিছু কর্তব্যপরায়ণ জল নাকি হাজার বাধা উপেক্ষা করে গেরস্তের ঘটিতে ঠিক হাজির হচ্ছে কিন্তু প্রবল পরিশ্রমের কারণে চেহারা হয়ে যাচ্ছে ঘোলা। এত ঘোলা যে মাছও ধরা যায় না।

গজমকালো

গজ নিয়ে জমকালো ব্যাপার ঘটানর সোজা উপায় হাতির সঙ্গে ছবি তুলে নেটে তুলে

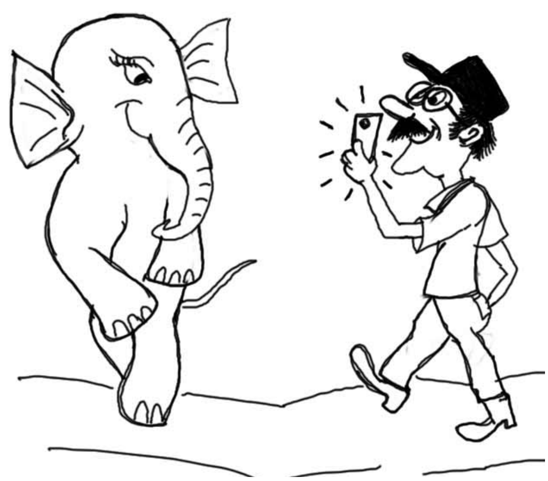

দেওয়া। কিন্তু 'হাতির সঙ্গে সেলফি তুলে গাত্র হলো থ্যাঁতা!' তিনদিনে দু-জন মারা যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল লাটাগুড়ির বনপথে হাতি দেখে পাব্লিকের 'হাই হাতি হাই হাতি হাই হাই' ভাবটা থামবে। কিন্তু সে লক্ষণ নেই কো! হাতি যেন ফ্যামিলির পোষা ডগি। হাতি রাস্তা পার হচ্ছে তো চুপচাপ গাড়িতে বসে থাকলেই হয়! খামোকা পথে নেমে মোবাইল তাক করে এগিয়ে যাওয়ার মানে কী? হাতি কি মোবাইলের মডেল দেখে প্রেমে পড়বে? পড়লে সামলাতে পারবি তো? কিন্তু মামা! যুগটাই কলির। কে শোনে কার অ্যাডভাইস!

ফলে তিন নম্বর ডেথটা স্রেফ নির্ভর করছে গজের মগজের ওপর। কবি কিন্তু বলে গেছেন 'গরীবের ঘরে হাতির বাড়া'। বেশি দিকগজ হোস নে।

টুক্রাণু

খুচরো দেখলে গোঁসা দিনহাটার রেলবাবুদের। হলদিবাড়িতে ইলেকট্রিক চুল্লি হওয়ায় মৃতদেহরা খুশি। জলপাইগুড়িতে দু-নম্বর চুল্লি মেরামত হওয়ায় মৃতদেহরা ডবল খুশি। আলিপুরদুয়ারে এবার, ইলিশ নয়, চুনোপুঁটির উৎসব। মরতে বসেছে কোচবিহারের ডজন খানেক দিঘি। কোচবিহারেই রাজার কবিরাজি বাগান এখন 'আদুর বাদুড় চালতা বাদুড়'। ফালাকাটার একটা পথে শিলান্যাসের শিলা ছাড়া আর কোনও পাথর পড়েনি। ডুয়ার্সে পেঁয়াজের দাম হাই-ফাই হেতু পেঁয়াজি শিল্প সমস্যায়। দিনহাটায় সরকারী আবাসনের আলো দিনে জ্বলে কিন্তু রাতে নেভে না। চমচমের জিআই নিয়াই ছাড়বে বেলাকোবা। চা পাতার গুণগুণ বিচার করতে একপাল হাতি প্রবেশ করেছিল রাজগঞ্জ বাগানে। এক খাঁচা মুরগি চুরি করে পালাবার পথে থানার সামনে গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেল চোরের—ওদলাবাড়িতে। দেড় ডজন এটিএম থাকা সত্ত্বেও টাকা তুলুন দিকি ধূপগুড়িতে। জাল টাকা ফের উদ্ধার, তবে মালদা নয়, বীরপাড়ায়। দলগাঁও স্টেশনের কাছে লেবেল ক্রসিং-এ জ্যামজট ঐতিহাসিক হতে চলেছে। কালচিনির কাছে বাইসনকে বাই বাই জানাতে গিয়ে উরুভঙ্গ শ্রমিকের। দেবীর অনুমতি ছাড়াই কারা জানি ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে তোলা তুলছে বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ির পুরবরাহরা প্রতিভা বিশেষ—যতই ধরো, ঠিক ঘুরে বেড়াবে।

গজগুঞ্জরণ

ব্যাসবাক্য করলে 'গজের নিমিত্ত গুঞ্জরণ'। আহা! অলির গুঞ্জন মানেই বেশ বসন্ত বসন্ত ভাব। গুঞ্জনে দোলে যে ভ্রমর সুর তোলে সে উড়ে উড়ে।' না কামড়ালে মৌমাছি 'অলি'। কিন্তু সাউন্ড বক্স লাগিয়ে অলি গুণগুণ? শুনেছি কোথায় জানি ট্রাফিকে থমকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজে। কিন্তু ডুয়ার্সে রেল লাইনের ধারে সাউন্ড বক্স লাগিয়ে গুঞ্জন শোনাবার মানে? আরে না মামা! অলির কথা শুনে বকুল হাসতে পারে, কিন্তু হাতিরা মোটেই হাসে না। উল্টে তারা দুমদাম ভেগে যায়। হাতির যাতে রেল লাইন থেকে দূরে থাকে তাই দরকারে বক্স বাজিয়ে আবহাওয়া গুঞ্জরিত করা হবে। অসমে নাকি অলির কথা শুনিয়ে খানিকটা ফল মিলেছে। দেখা যাক, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সেটা কেমন কাজ করে। তবে মামা, হাতির বুদ্ধির ব্যাপারটা মাথায় রাখলে মনে হয় ওরা খুব তাড়াতাড়িই ফাঁকিটা ধরে ফেলবে। তখন ভাই সাউন্ড বক্সগুলো থেকে তফাতে থাকিস।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার **৪০৬৪৪০৯৭**

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে প্রতিবেদক ঘুরেছেন ওদলাবাড়িকে কেন্দ্র করে দুই নয়নাভিরাম চা-বাগান মানাবাড়ি ও পাথরঝোরা। মানাবাড়ি সাধারণের যাতায়াতের পথে পড়লেও পাথরঝোরা কিন্তু পুরোটাই রং রুটে।

গরবিনী ডুয়ার্স স্বর্ণগর্ভা। ডুয়ার্সের মাটিতে সবুজ সোনার ঢেউ। এই সবুজের ঢেউয়ের মাঝে রয়েছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির হাসিকান্না, সংগ্রাম, শোষণ, অত্যাচার, অনাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। শাল, সেগুন, ধুপি, ট্যুনের মাঝে ডুয়ার্সের সবুজ বনভূমির শান্তি মাঝেমধ্যেই বিনষ্ট হয় গজরাজের বৃংহতিতে, ভয়ংকর বিষধর কিংকোবরার হিমশীতল চাহনি আর হিসহিস শব্দের শাসানিতে, ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গির বাহক মশককুলের অপ্রতিহত দাপাদাপিতে আর ম্যালেরিয়া, মহামারী এবং কোলাজ্বরের ভয়ংকর দাপটে। তবুও ডুয়ার্সের তুলনা ডুয়ার্সই। ডুয়ার্সের আর এক নাম চা। চা সম্রাজ্যই জন্ম দিয়েছিল আজকের ডুয়ার্সকে। ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে চা সাম্রাজ্য গড়তে জানকে বাজি করে এসেছিল আদিবাসীরা। আজকের ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকা জুড়ে রাজবংশী জনজাতির বসতি হলেও চা বাগিচার শ্রমিকের তালিকায় এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব চোখে প্রায় পড়ে না বললেই চলে। একদিকে গহন বন, অপর দিকে পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদী নিয়ে ঘেরা আমাদের এই ডুয়ার্সের একই অঙ্গে বহু রূপ। গ্রীষ্মকালে নদীগুলির অধিকাংশই শীর্ণ। বর্ষাকালে ভয়ংকরী। ডুয়ার্সের একদিকে যেমন গড়ে উঠেছে নদীর পলির স্তরের মতো নানা প্রাণীবৈচিত্র অন্যদিকে নানান জনবিন্যাস। জনবিন্যাসের উৎসভূমি দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ির সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস। আজকের ডুয়ার্সকে জানতে হলে, চিনতে হলে জানতে হবে অতীতের ডুয়ার্সকে। শুনতে হবে চা বাগিচা স্থাপনের ইতিহাসের পাশাপাশি এখানকার জনবসতির বৈচিত্র্য।

বাগিচায় বাগিচায় ক্ষেত্রসমীক্ষায় ঢোকার আগে একটু অতীত ইতিহাস চর্চা করে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ বর্তমান আঞ্চলিক ইতিহাসকে যদি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কোনও কিছু মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুম্ফা, মিনার গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বর্তমান জল্পেশ মন্দির ইংরেজ শাসনকালে ধর্মীয় কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এখানে শিবপুজো উপলক্ষে মেলা বসত তিন সপ্তাহ ধরে এবং এই অঞ্চল ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসার কেন্দ্র যেখানে তিব্বত এবং ভুটান থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা নিয়ে আসত। প্রকৃতপক্ষে 'সংগ্রিলা' বা ভুটান তখন ছিল বহিরাগতদের কাছে অজানা এবং নিষিদ্ধ দেশ। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে সামরিক শক্তির পাশাপাশি পারস্পরিক বোঝাপড়াও যে প্রয়োজন সেটা দূরদর্শী ইংরেজ শাসকদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, অসুবিধা হয়ও নি। দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা ভুটানকে সামরিক শক্তিতে যে পদানত করা যাবে না তা ইংরেজ শাসকেরা কূটনীতি দিয়েই অনুভব করেছিল। কারণ তারা এসেছিল ব্যবসা করতে। তাই ২৮৮ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত হিমালয়ের পাদদেশের এই ভূখণ্ডটির প্রতি ইংরেজ শাসকদের আগ্রহ এই জন্যই ছিল যে এখানকার দরজাগুলি দিয়েই হিমালয় পাহাড়ে প্রবেশের পথ তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ ছিল। কারণ ইংরেজরা লক্ষ্য করেছিল ভুটানিরা গিরিপথ দিয়ে সমতলে নেমে এসে লুঠপাট চালিয়ে ফিরে যেত। আবার তাদের চোখে এটাও পড়েছিল যে, ভুটানিরা আবার এই গিরিপথ দিয়েই সমতলে এসে ব্যবসা চালাত।

ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা। তাই ভুটানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তিব্বতের শাসককে রুষ্ট করার কোনও অভিপ্রায় ইংরেজদের ছিল না। যেহেতু রংপুর ছিল তিব্বতিদের ব্যবসার কেন্দ্র, তাই কোম্পানি শাসকেরা তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এই কারণেই যে, রংপুরে ভুটিয়াদের সঙ্গে বার্ষিক পণ্য লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই লক্ষ টাকা, সেই সময়কার বিচারে যা ছিল বিশাল পরিমাণ আর্থিক অঙ্কের। আর কারণেই একই ভাবে ডুয়ার্সের আমবাড়ি-ফালাকাটায় বিশ্রাম করে তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে রংপুরে যেত।

তাই পাখির চোখ করেছিল ইংরেজরা আসাম, দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সকে কেন্দ্র করে সিকিম, ভুটান এবং তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করার জন্য। সেই কারণেই ১৮৬৫ সালের ১১ নভেম্বর ভুটানের সিনচুলাতে হল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভুটানের ঐতিহাসিক সন্ধি চুক্তি। ইংরেজরা ভুটানরাজের কাছ থেকে আমবাড়ি-ফালাকাটাসহ অঠেরোটি দুয়ার বা প্রবেশ পথ এবং তিস্তার বাম তীরবর্তী এলাকা তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং তার জন্য তারা ভুটান রাজাকে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আসলে ব্যবসায়ী কোম্পানি হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পরবর্তী কালে রাজস্ব সংগ্রহের প্রশ্নে লাভ লোকসানের হিসাবের দিকেই মন দিয়েছিল এবং সেই কারণেই প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ আসামকে চা গাছ আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে ইংরেজরা রাজি ছিল না। ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যপথ হিসাবেই তারা ডুয়ার্সকে ভেবেছিল। সিনচুলা চুক্তিতে সিকিম-ভুটানের সংযোগস্থল থেকে পশ্চিমে তিস্তা নদী এবং পূর্বে জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ কালিম্পংসহ আমবাড়ি-ফালাকাটা এবং রংপুর জেলা এবং কোচবিহার রাজ্যসীমার মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ এবং আসামের কামরূপ জেলার সীমানা পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশের সমগ্র অঞ্চলটিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

> ইংরেজরা লক্ষ্য করেছিল ভুটানিরা গিরিপথ দিয়ে সমতলে নেমে এসে লুঠপাট চালিয়ে ফিরে যেত। আবার তাদের চোখে এটাও পড়েছিল যে, ভুটানিরা আবার এই গিরিপথ দিয়েই সমতলে এসে ব্যবসা চালাত। ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

সিঞ্চুলা চুক্তির মাধ্যমে ভুটানের যে সমস্ত অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাদের নিয়ে দুটি এলাকা গঠন করা হয়েছিল। পূর্ব ডুয়ার্স অর্থাৎ সংকোশ নদীর পূর্ব পাড় থেকে শুরু করে আসামের হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ডুয়ার্স এলাকা। তিস্তা নদীর পূর্ব পাড় থেকে সংকোশ নদীর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল পশ্চিম ডুয়ার্স। পূর্ব ডুয়ার্সকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পশ্চিম ডুয়ার্সে ছিল তিনটি মহকুমা— (১) তিস্তা ও তোর্সা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত সদর মহকুমার সদর দপ্তর ছিল ময়নাগুড়ি। (২) তোর্সা ও সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত

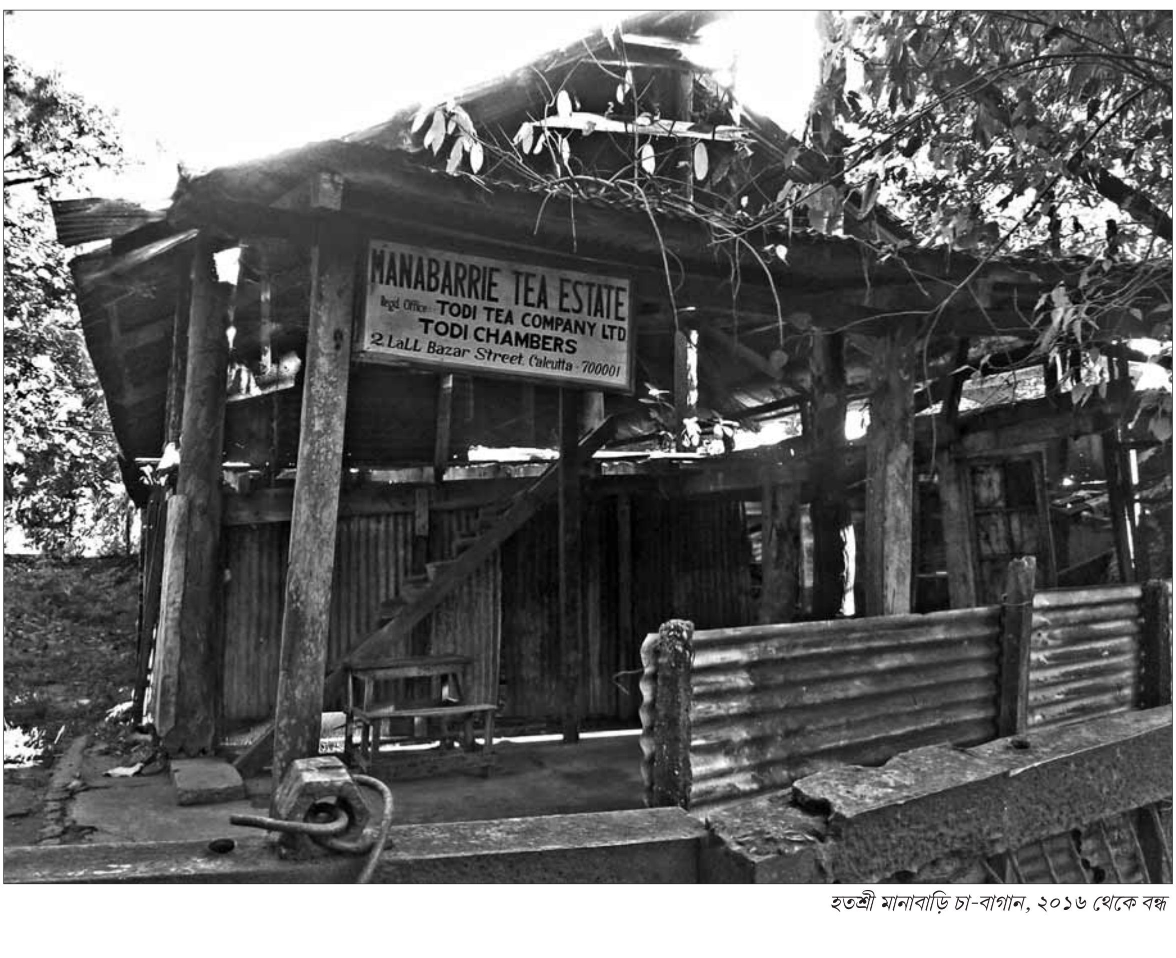

হতশ্রী মানাবাড়ি চা-বাগান, ২০১৬ থেকে বন্ধ

একজন মাত্র নার্স এবং একজন স্বাস্থ্যকর্মী মানাবাড়ির শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে চলেছেন।

বক্সা মহকুমার সদর দপ্তর ছিল আলিপুরদুয়ার। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল ডালিমকোট মহকুমা যার সদর দপ্তর ছিল কালিম্পং। ১৮৬৭ সালে ডালিমকোট মহকুমার অবলুপ্তি ঘটিয়ে তিস্তা নদীর উভয়পারের ৯৬০ বর্গ মাইল আয়তনবিশিষ্ট পার্বত্য এলাকা নিয়ে গঠিত হয় সদরর মহকুমা এবং ২৭৪ বর্গ মাইলব্যাপী তরাই মহকুমা, পাহাড়ের পাদদেশ ছিল এর অন্তর্গত। এর সদর কার্যালয় ছিল ফাঁসিদেওয়ার হাঁসখাওয়াতে। জনশূন্য গ্রাম শিলিগুড়ি তখন ছিল জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর পরগনার একটি মৌজা। ১৮৮১ সালে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু এলাকাসহ শিলিগুড়ি মৌজাকে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করে তরাই মহকুমার সদর দপ্তরকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৮১ সালে তরাই মহকুমার অবলুপ্তি ঘটানো হল। তরাই অঞ্চল এবং তিস্তার পশ্চিম পারেরসঙ্গে নিম্নভূমিকে যুক্ত করে গঠন করা হল কার্শিয়াং মহকুমা। ১৯০৭ সালে গঠিত হল শিলিগুড়ি মহকুমা। ১৯১৬ সালে কালিম্পংকে সদর দপ্তর করে গঠিত হল কালিম্পং মহকুমা।

মানাবাড়ি টি গার্ডেন

এবারের ক্ষেত্রসমীক্ষা কালিম্পংয়ের পাদদেশে ওদলাবাড়িকে কেন্দ্র করে। ভোরের প্যাসেঞ্জারে শিলিগুড়ি জংশন থেকে রওয়ানা দিয়ে সকাল ন'টায় নামলাম ওদলাবাড়ি স্টেশনে। স্টেশনের বাইরেই পাথরঝোরা মানাবাড়ি যাওয়ার পিজো স্ট্যান্ড। বড়ো বড়ো জোঙ্গাগুলো শেয়ারে পাথরঝোরা, মানাবাড়ি নিয়ে যায়। ওদলাবাড়িতে পুরী মিষ্টি সহযোগে উদরপূর্তি করে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে পড়া গেল। সরাসরি যাব পাথরঝোরা। পথে মানাবাড়ি। মালবাজার মহকুমার মানাবাড়ি চা-বাগানটির পরিচালক টোডি টি কোং লিমিটেড। বাগানটি আইটিপিএ এবং টিপা-এর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি কোন সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল তা জানা যায়নি। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ৩ জন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে বাগানটি বন্ধ ছিল। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর **মানাবাড়ি**। কোম্পানির ঠিকানা লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-১। কোম্পানির হেড অফিস কলকাতা। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ৫টি। এগুলি হল এন.ইউ.পি.ডব্লু., সি.বি.এম.ইউ, পি.টি.ডব্লু.ইউ, টি.ডি.পি.ডব্লু.ইউ, ডি.টি.ডি.পি.এল.ইউ।

মানাবাড়ি চা-বাগানের আয়তন ৪৫০ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্রও ৪৫০ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমির পরিমাণ ২৭১ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১০০.০৬ হেক্টর। ড্রেন এবং

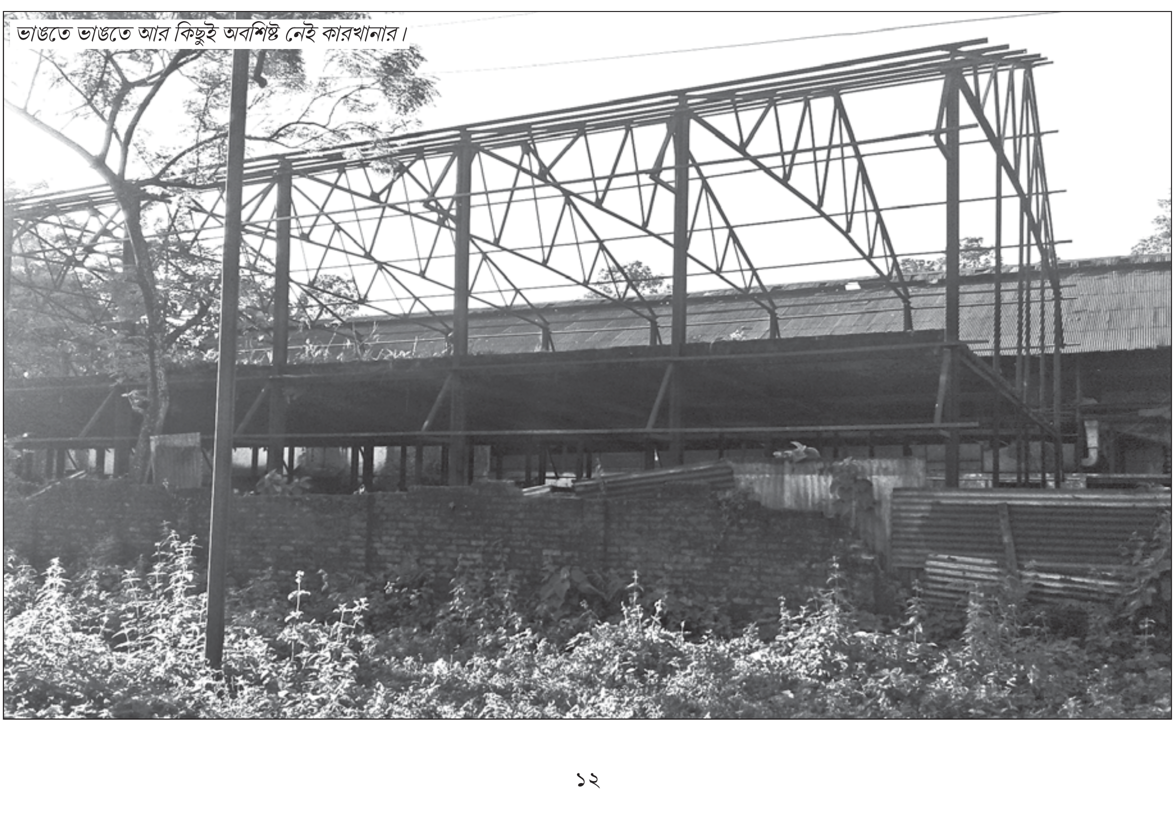

ভাঙতে ভাঙতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই কারখানার।

সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ২৭১.১৬ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ২৭১.১৬ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশান এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৫০০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

যেহেতু অফ-রুট তাই পাথরঝোরা আজও লোকচক্ষুর আড়ালে। ওদলাবাড়ি থেকে পাথরঝোরা এই ১১ কিলোমিটার পথ আগে ছিল পায়ে হাঁটা বা চা-বাগানের গাড়িই ছিল অন্যতম যানবাহন। এক সময়ে শিলিগুড়ি থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের মিনিবাস সকালে, দুপুরে যাতায়াত করত। ইদানিং কিছু জিপ, অটো যাতায়াত করে। ভরসা গুটিকয়েক জিপ, জোঙ্গা, অটো অথবা পদযুগল।

ঘন সবুজ বন আর নীল পাহাড়কে সঙ্গী করে ওদলাবাড়ি থেকে মানাবাড়ি। সেই আদ্যিকালের কাঠের ঘরবাড়ি। দু'-চার পা এগোলেই সবুজ সমুদ্র, যেদিকেই দৃষ্টি ফেরান শুধু চা-বাগান। নাম মানাবাড়ি। সরু পিচের রাস্তা। ঢাপ, চিলৌনি, শিরীষ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, জারুল। বসন্তে যেন নানা রঙের মিছিলে বর্ণময় চিত্র। ক্লান্তিবোধ করলে গাছের ছায়ায় একটু জিরানো যাবে।

রূপসী ডুয়ার্সের পথে প্রান্তরে অজস্র নদী, নির্ঝর, পাহাড়ি অরণ্য। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। লিস, ঘিস, চেল— ছন্দ মিলিয়ে সুন্দর সব নদীর নাম। পূবং পাহাড়ের কোলে এমনই অসাধারণ সৌন্দর্যখনি পাথরঝোরা। পর্যটন মানচিত্রে অবশ্য নেই পাথরঝোরা। কখনও কোনও নিঃসঙ্গ পথিক, বোহেমিয়ান পথ ভুলে যেন চলে আসেন পাথরঝোরার কাছে।

ওদলাবাড়ি থেকে শুক্রবার সকালে পাথরঝোরা বাগানে হাটবাস যেত। হাটবারে বাবুরাও চা-বাগানের গাড়িতে সেজেগুজে আসেন সপ্তাহের বাজার করতে। ছবির মতো মানাবাড়ি গ্রামের মানাবাড়ি চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ২০ জন। করণিক শূন্য। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৩০০। মোট জনসংখ্যা ৩২৫০। স্থায়ী শ্রমিক ৩৪২ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ১১৬ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ২ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংখ্যা ১৪০ (বস্তিয়ার) জন। কম্পিউটার অপারেটর শূন্য। সর্বমোট সাব স্টাফ ২০।

> রূপসী ডুয়ার্সের পথে প্রান্তরে অজস্র নদী, নির্ঝর, পাহাড়ি অরণ্য। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। লিস, ঘিস, চেল— ছন্দ মিলিয়ে সুন্দর সব নদীর নাম। পূবং পাহাড়ের কোলে এমনই অসাধারণ সৌন্দর্যখনি পাথরঝোরা। পর্যটন মানচিত্রে অবশ্য নেই পাথরঝোরা।

ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১ জন। মোট কর্মরত শ্রমিক ৩৬৫ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ২৮৮৫। মানাবাড়ি চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত কাঁচা চা-পাতা গড়ে ১০ লাখ কেজি, ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা গড়ে প্রায় ২.৫ লক্ষ কেজি উৎপাদিত হত। বর্তমানে ফ্যাক্টরি বন্ধ। বাইরের বাগান থেকে কাঁচা পাতা কিনে তার থেকে চা প্রস্তুত করার পরিকাঠামো ফ্যাক্টরিতে নেই। উৎপাদিত চা প্রকৃতিগতভাবে সিটিসি এবং ইনঅরগ্যানিক। মানাবাড়ি বাগানটিকে চরিত্রগত দিক দিয়ে দুর্বল, পরিকাঠামোহীন, নিম্নমানের বাগানে পরিণত করেছে বর্তমান পরিচালকবর্গ একথা বললে সত্যের অপলাপ হয় না।

মানাবাড়ি টি গার্ডেন এস.জি.আর.ওয়াই. বা এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস.-এর সুবিধা পায় না। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি অর্থনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক অব বরোদা। বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে ব্যাঙ্ক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স কোম্পানি হেড অফিস থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার টোডি টি কোম্পানি লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা জানা যায়নি। বাগানটি লিজ রিনিউয়্যালের জন্য আবেদন করেছে কি না বলতে চাননি বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগানটির লিজের আবেদন যদি করে থাকে আবেদনের তারিখ জানাতেও অস্বীকার করেছে বাগানের অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা।৫

মানাবাড়ি চা-বাগানে আলাদা আলাদা

পাথরঝোরা টি গার্ডেন

ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ১৭৫টি। এখনও বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাসের সংখ্যা ৭৫টি। আধা পাকা বাড়ির সংখ্যা ৫০টি, যা বৈদ্যুতিকরণ হয়নি। মোট শ্রমিক আবাস ৩০০টি। মোট শ্রমিকসংখ্যা ৩৬৫ জন। বাগানে শতকরা ৮২ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। নতুন পাকা বাসগৃহের জন্য বাগানের কোনও বাৎসরিক খরচ নেই যা দুর্ভাগ্যজনক। সেমি পাকা বাসগৃহ থেকে পূর্ণাঙ্গ পাকা বাসগৃহে রূপান্তরিত করার জন্য বাৎসরিক কোনও খরচ হয় না। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক গড় ব্যয় ৩০ হাজার টাকা মাত্র। তথ্যসূত্র বলছে ২০০৯-১২ মাত্র ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ২২৫টি। বাগানে বৈদ্যুতিকরণের জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে আবেদনের তারিখ ২০০২। হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির সংখ্যা একটি করে। হাসপাতালে মেল ওয়ার্ড ৪টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৪টি থাকলেও বর্তমানে ৩টি নষ্ট। আইসোলেশন ওয়ার্ড নেই। মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারও নেই। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বাগিচায় বহু বছর ধরেই নেই। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে ১২৭ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। ডাক্তার নেই, নার্স মাত্র ১ জন। প্রশিক্ষিত, নাম কাঞ্চি সুব্বা। বাগানে নার্সের সহযোগী আয়া বা মিড সার্ভেন্ট নেই, কম্পাউন্ডার নেই, স্বাস্থ্য সহযোগী ১ জন। বাগিচায় ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না এবং পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহও করা হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহের কোনও প্রশ্নই নেই, এমনকি নিয়মিত ডায়েট চার্টও অনুসরণ করা হয় না। মেটারনিটি সুবিধা পাওয়া নারী শ্রমিকদের বাৎসরিক গড় ২৫ জন।

মানাবাড়ি চা বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই, ভর্তুকি দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। মোবাইল ক্রেশের সংখ্যা ৫টি। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। ক্রেশে শৌচাগার নেই। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয় না। পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট ৫ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। বাগানে ক্লাব আছে, আছে খেলার মাঠও।

মানাবাড়ি চা-বাগিচায় বিগত অর্থবর্ষে কোনও টাকাই শ্রমিকদের প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েনি। বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটির মোট অর্থ কত তা জানা যায়নি বাগিচা বন্ধ থাকার ফলে। বিগত অর্থবর্ষে কতজন শ্রমিক গ্র্যাচুইটির অর্থ পেয়েছে তা জানা যায়নি। জানা যায়নি বিগত অর্থবর্ষের গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ও আয়ব্যয়ের হিসেব।

পাথরঝোরা চা-বাগিচা

পাখিদের স্বর্গরাজ্য পাথরঝোরা। বারান্দায় বসে শুনতে পাওয়া যায় পাখিদের গান। বউ কথা কও, চোখ গেল চোখ গেল। অবিশ্রান্ত কোকিলের কুহু কুহু কুহু। সেই সঙ্গে কাঠঠোকরার তবলাসঙ্গত। বাবুদের

বসন্তে চা-বাগানের পথ আরও সুন্দর। পথ ভরে যায় রাশি রাশি শিমুলতুলোয়। ফেটে ফেটে পড়ে বিচি থেকে তুলো। একদা তুরিবাড়ি অঞ্চল ছিল ডেঞ্জার জোন। ইদানিং মানুষের চেয়ে হাতির অত্যাচার অনেক বেড়েছে। বুনো হাতির দল ফসল পাকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলাবাগান, ভুট্টাখেতে। হাঁড়িয়া, মারুয়ার নেশায় মদেশিয়া ও নেপালিদের ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়ে। মাঝে মধ্যে কাছাকাছি জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ বের হয়ে আসে। চুপটি করে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাড়ে, চা-বাগানের ভিতর।

কোয়ার্টার্সের পিছনে লেতি নদী, জঙ্গল-পাহাড়। বর্ষার জলের শব্দ শোনা যায়। শীতে একেবারে শুনশান বালি-পাথর। দলবেঁধে নদী-পাহাড়-পাকদণ্ডী পথে বেড়ানো যায়। বসন্তে ফুল্ল সমীরণে, মায়াবী জ্যোৎস্নায় পাথরঝোরা ভীষণ অতিপ্রাকৃত। জ্যোৎস্নায় অরণ্য, চা-বাগান, পাহাড় বড়ই সুন্দর।

মালবাজার মহকুমার পাথরঝোরা চা-বাগানটির পরিচালকগোষ্ঠী পাথরঝোরা টি গার্ডেন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি টাই অর্থাৎ টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৯৭ সালে বাগিচাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ৬ জন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে বাগানের ম্যানেজার ছিলেন স্বপন ব্যানার্জি। কোম্পানির মালিকের নাম ব্রিজমোহন, সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কোম্পানির ঠিকানা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯। কোম্পানির হেড অফিস কলকাতা। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ২টি। এগুলি হল টি.ডি.পি.ডব্লু.ইউ., ডি.টি.ডি.পি.এল.ইউ। বর্তমানে বাগানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব্রিজমোহনের সন্তান বি.কে.মোহন।

পাথরঝোরা চা-বাগানের আয়তন ৫৬৬.৮ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৩৬৯.৪৪ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমি নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদী ক্ষেত্র ৪৩.৬৮ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ১৫৯.৩৬ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ১৫৬.২ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৭০১ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

আদিবাসী রমণীরা গাছের নিচে, খোলা মাঠে বসে হাঁড়িয়া নিয়ে। ওদলাবাড়িতে রবিবারে হাটবারের দিনে পাথরঝোরার পথে বাবু, শ্রমিকদের যাতায়াত বেশি। বসন্তে চা-বাগানের পথ আরও সুন্দর। পথ ভরে যায় রাশি রাশি শিমুলতুলোয়। ফেটে ফেটে পড়ে বিচি থেকে তুলো। একদা তুরিবাড়ি অঞ্চল ছিল ডেঞ্জার জোন। ইদানিং মানুষের চেয়ে হাতির অত্যাচার অনেক বেড়েছে। বুনো হাতির দল ফসল পাকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলাবাগান, ভুট্টাখেতে। হাঁড়িয়া, মারুয়ার নেশায় মদেশিয়া ও নেপালিদের ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়ে। মাঝে মধ্যে কাছাকাছি জঙ্গল থেকে চিতাবাঘ বের হয়ে আসে। চুপটি করে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাড়ে, চা-বাগানের ভিতর। তুরিবাড়ি ছাড়ালে পথ আরও নির্জন।

পাথরঝোরা চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ৮৯ জন। করণিক ৭ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১৩ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৮৪৯ জন। মোট জনসংখ্যা ৪২৪৬। স্থায়ী শ্রমিক ৯১৪ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ২৬০ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৫৬ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জন। কম্পিউটার অপারেটর শূন্য। সর্বমোট সাব স্টাফ ৮৯ জন।

ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল এবং স্থায়ী শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২০। মোট কর্মরত শ্রমিক ১০৯৪ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৩১৫২।

পাথরঝোরা চা-বাগিচায় নিজস্ব উৎপাদিত কাঁচা চা-পাতা ১২ লক্ষ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ২.৫ - ৩ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চা ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ বছরে ২.৫ - ৩ লাখ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক। পাথরঝোরা চা-বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে মধ্যম মানের বাগান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পরিকাঠামোগতভাবে বাগানটি সমৃদ্ধ। কানাড়া ব্যাঙ্কের কাছে পাথরঝোরা বাগান আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ। বাগান পরিচালনার কার্যকরী মূলধন সরবরাহ করে ব্যাঙ্ক, নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স এবং পাতা বিক্রি বাবদ আয় থেকে। বাগিচাটির লিজ হোল্ডার পাথরঝোরা টি গার্ডেন প্রাইভেট লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ছিল ২৮.০৫.২০০৩। বাগানটি লিজ রিনিউয়্যালের জন্য আবেদন করে ২৬.০৫.২০০৩ তারিখে। পাথরঝোরা চা-বাগিচায় ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ৭৪৫। বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক বসবাস করে। বাগানে শতকরা ৬৮ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক গড় ব্যয় ৭-৮ লক্ষ টাকা। বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ২৭০। বাগিচায় হাসপাতাল ১টি। আলাদা আলাদাভাবে পুরুষ, মহিলা এবং আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেল ওয়ার্ড ৪টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৪টি। আইসোলেশন এবং মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই। বাগিচায় হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারও নেই। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে প্রায় হাজারের কাছাকাছি শ্রমিককে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা মাল মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। ডাক্তারের নাম মনোজকুমার সাহা। এল.এম.এফ. ডাক্তার। ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত। বাগানে নার্স নেই। মিড সার্ভেন্ট আছে ৩ জন। কম্পাউন্ডার, স্বাস্থ্য সহযোগী নেই। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করে উন্নতমানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না। বছরে গড়ে ১৫ জন নারী শ্রমিক বাগিচা থেকে মেটারনিটি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করে। বাগিচায় ২০১০ সাল থেকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই।

পাথরঝোরা চা-বাগানে ভরতুকিবিহীন ক্যান্টিন আছে। বাগিচায় স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমান ক্রেশ আছে একটি করে। ক্রেশে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার আছে। ক্রেশে শিশুদের দুধ, বিস্কুট এবং পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়। শিশুদের পোশাকও দেওয়া হয়। তবে ক্রেশে পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ক্রেশে মোট পরিচারিকার সংখ্যা ৩ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। বাগিচায় ১টি স্কুল বাসে করে বাগানের বাচ্চাদের নিটকতম বিদ্যালয়ে পরিষেবা প্রদান করা হয়। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব এবং খেলার মাঠ আছে।

ঝিঁঝির ডাক, পাখিদের অবিশ্রান্ত কিচিরমিচির, কোকিলের শিস শোনা যায় ছায়াঘন পথে। পাথরঝোরাকে বুড়ি করে অনেক জায়গায় পায়ে হেঁটে বেড়ানো যায় লা-মেটার, চুইখিম, মানঝিং, নোয়াম, বুধবাড়ি। থাকা খাওয়া বনবাংলোয় অথবা গ্রাম্য বস্তির দীনহীন পর্ণকুটিরে।

পাথরঝোরা টি গার্ডেনে বছরে গড়ে ৫০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ডে নিয়মিত জমা পরে। প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া নেই। চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকেরা নিয়মিত মজুরি পায়। মজুরি, রেশন বকেয়া নেই। ছাতা, কম্বল, জ্বালানি, চপ্পল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। তবে বিগত অর্থবর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ এবং বছরে গড়ে কত জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন সেই তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঝিঁঝির ডাক, পাখিদের অবিশ্রান্ত কিচিরমিচির, কোকিলের শিস শোনা যায় ছায়াঘন পথে। পাথরঝোরাকে বুড়ি করে অনেক জায়গায় পায়ে হেঁটে বেড়ানো যায় লা-মেটার, চুইখিম, মানঝিং, নোয়াম, বুধবাড়ি। থাকা খাওয়া বনবাংলোয় অথবা গ্রাম্য বস্তির দীনহীন পর্ণকুটিরে। পাথরঝোরা থেকে পূব দিকে চা-বাগান, রুমঝুম নদী, ফাগু ফরেস্ট, নোয়াম বিট চেল নদী পার হয়ে গোরুবাথান যাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে সোমবাড়ি কারণ সোমবারে গোরুবাথানে বড় ধরনের হাট বসে। পাথরঝোরা থেকে গোরুবাথানের দূরত্ব ৩-৪ কিলোমিটারের বেশি নয়। দূরন্ত বর্ষায় চেল নদী পার হওয়া কষ্টকর। এছাড়া বুনো হাতির উপদ্রব তো আছেই গোরুবাথান থেকে খুব কাছেই ডালিম দুর্গ, পাপরখেতি অসাধারণ সৌন্দর্যখনি। এছাড়া চা-বাগান তো আছেই। গোরুবাথান থেকে যাওয়া যায় লাভা, সারা বছরই ঘন কুয়াশা ও ব্যাপক ঠান্ডা। গোরুবাথানে রাত্রিযাপনের ভাল হোটেল না থাকলেও গুটিকয়েক সরকারি অতিথিশালা এবং বনবাংলো আছে। পাথরঝোরা থেকে ওদলাবাড়ি ১১ কিমি, গোরুবাথান ৪ কিমি, মানঝিং ৫ কিমি, বুধবাড়ি ১৫ কিমি। ওদলাবাড়িতে সরকারি অতিথিনিবাস আছে। কাঠামবাড়ির বনবাংলো বছর ব্যাপী ফাঁকা থাকে। শিলিগুড়িতে অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর বনদপ্তরে বুকিং করা যায়। লোকালয়ের কাছে অবস্থিত কাঠামবাড়ি বনবাংলো খুবই সুন্দর। কাঠামবাড়ি থেকে যোগেশচন্দ্র চা-বাগান, ক্রান্তিবাজার হয়ে খুবই কাছে লাটাগুড়ি।

পাথরঝোরায় লেতি নদীর ধারে চা-বাগানের বাংলোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই পূবং পাহাড়। বাংলোর মুখোমুখি টিলা পাহাড়। বড় সাহেবের কোঠি। আরও ওপরে টপলাইন। চা শ্রমিকদের ডেরা। পাথরঝোরায় চা-বাগিচার নির্জন পথে এখনও দেখা যাবে ময়ূর, খরগোস। বাংলো থেকে কয়েক পা এগোলেই আমলকি, হরতুকি, রুদ্রাক্ষ, বহেরা, তেজপাতা গাছ। নদীর দু'পাশে অসংখ্য চালতা গাছ। বুনো কলা গাছের সারি। অসংখ্য বাঁশঝাড়, পাহাড়ের বুকে দুর্লভ ভেষজ গাছ, নয়ন ভোলানো অর্কিড। শুধু পূবং নয়, মানঝিং, বুধবাড়ির চড়াই পথ এবং চোরবাটো ধরে সব জায়গাতেই যাওয়া যায়। তবে বুকে পিঠে টান লাগে।

পাহাড়ে চাষ হচ্ছে বড় এলাচ, কমলালেবু, কোয়াশ, ফুলঝাড়ু। শুক্রবার, পাথরঝোরা চা-বাগানের ফ্যাক্টরির পাশে বসে সাপ্তাহিক গুদরিহাট। অনেকে তলবহাটও বলে। কারণ ওই দিন কুলি কামিনরা সারা সপ্তাহের মজুরি পায় এবং হাটুরের দল ওদলাবাড়ি, মালবাজার থেকে ট্রাকে মালপত্তর নিয়ে আসে। শুকরের মাংস, হাঁড়িয়া পানের ঢালাও ব্যবসা জমে ওঠে।

পাথরঝোরার যাতায়াত ব্যবস্থা আজও অনুন্নত। বাসের উপর ভরসা কম। মানাবাড়ি, তুরিবাড়ি, পাথরঝোরা অঞ্চলের মানুষজনের দীর্ঘদিনের দাবী খান তিনেক বাস। লজ বা কটেজ তৈরি করলে পর্যটন শিল্পের যেমন উন্নতি ঘটবে, তেমনই পাথরঝোরায় প্রাণ সঞ্চার হবে।

বড়দিন স্পেশাল

ডুয়ার্সে খ্রিস্টধর্মের জনপ্রিয়তা আজও বেড়ে চলেছে কল্যাণের পথেই

অশিক্ষা অনাহার অজ্ঞানতা অস্বাস্থ্য অন্ধকারের পাঁক ঠেলে অসহায় মানুষগুলিকে তুলে আনবার জন্য যেখানে চেষ্টা চলেছে অবিরাম, চোখ বন্ধ করে সবার আগে সাধুবাদ জানাতেই হয় তাকে। বিনিময়ে ওরা যদি ওদের ধর্ম নিতে বলে তো ক্ষতিটা কোথায়? অপরাধটাই বা কোথায়? 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' বন্ধ করে মানুষের কল্যাণই যদি আসল ধর্ম হয়, মানুষকে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য যদি জাত-ধর্ম বদলাতে হয়, তবে শুভ বড়দিনে সেই ধর্মেরই জয়গান গাইব আমরা ডুয়ার্সের সুস্থ চেতনার জনগণ, কারণ এতে নিজের ধর্ম খোয়া যায় না।

খানিক গড়িমসি করে হলেও ডুয়ার্সে শীত এসে পড়েছে। ঘন দুর্ভেদ্য কুয়াশা ভিনদেশী দস্যুদের মতই ঘিরে ফেলেছে গ্রাম ও শহর। শীত মানেই আসছে বড়দিন। শহরের মানুষ বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে বড়দিন পালন করে কেক খেয়ে, যদিও সবাই গির্জায় যায় না। ডিসেম্বরের এই শীতের মরশুমে পবিত্র বড়দিন পালন করার প্রাক্মুহূর্তে যখন উৎসবের মেজাজ তখন তথ্য পরিসংখ্যান বলছে ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ডুয়ার্স মানে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৪৬, যার মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৭৯ অর্থাৎ ৪.৮১ শতাংশ এবং যাদের অধিকাংশই চা বলয়ে বসবাস করে। দার্জিলিং জেলার মোট ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮২৩ জন জনসংখ্যার মধ্যে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৪৮ জন অর্থাৎ ৭.৬৩ শতাংশ ক্রিশ্চান যাদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ লেপচা সম্প্রদায়ের।

আরেক তথ্য পেলাম গোয়েন্দা বিভাগের এক বন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধুটির প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চা বলয়ে চার্চগুলির ধর্মান্তরকরণ পর্ব আজও একইরকম চলছে, আজকের উন্নত ভারতবর্ষেও যা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করা তথ্যগুলি সাজালে যেটা দাঁড়ায় সেটা হল (ক) এনজিও-দের ভূমিকা (খ) চা-বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রবল দারিদ্র (গ) মিশনারিদের উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও আদিবাসী সমাজের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও চেতনার মানোন্নয়ন এবং (ঘ) সরকারের নেতিবাচক রাজনীতি ও (ঙ) প্রত্যন্ত এলাকার উপজাতিভুক্ত মানুষের দীর্ঘ বঞ্চনার ক্ষোভ — ইত্যাদি মিলিয়ে প্রসার ঘটছে খ্রিষ্টধর্মের। রাজনীতির কারবারিদের হিসেব নিকেশের খাতায় খুব শীগগিরি যা ঢুকে পড়ল বলে।

জানা গিয়েছে চারটি সুবৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০,৫০০ কোটি টাকা গত অর্থবর্ষে প্রদান করা হয়েছে তরাই, ডুয়ার্স, আসাম এবং নর্থ ইস্টকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা ধর্মান্তরকরণ প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য, যার প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে উপজাতিভুক্ত পরিবারের দরিদ্র সন্তানদের বিনা পয়সায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুবিধার সম্প্রসারণ।

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যাদেরকে আমরা তথাকথিত এনজিও বলি, তারা ক্রিশ্চান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কোটি কোটি টাকা প্রদান করছে খ্রিস্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি, জানা গিয়েছে চারটি সুবৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০,৫০০ কোটি টাকা গত অর্থবর্ষে প্রদান করা হয়েছে তরাই, ডুয়ার্স, আসাম এবং নর্থ ইস্টকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা ধর্মান্তরকরণ প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য, যার প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে উপজাতিভুক্ত পরিবারের দরিদ্র সন্তানদের বিনা পয়সায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সুবিধার সম্প্রসারণ। এই অনুদানের একটা বড় অংশ আসছে আমেরিকা, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, স্পেন এবং ইতালি থেকে। কিছু শিক্ষিত আদিবাসী যুবক যুবতীদের চাকরি দিয়ে জনকল্যাণ তথা শিক্ষাদানের মোড়কে এবং বিনা পয়সায়

পিতৃপুরুষ প্রদত্ত ধর্ম, গোঁড়ামি, অজ্ঞানতা, অন্ধকারের বদলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে তারা যদি আধুনিক ধ্যানধারণা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা, যুগোপযোগী শিক্ষা, লিঙ্গসমতা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরিচ্ছন্নতার শিক্ষালাভ করে তাহলে সেই ধর্মান্তকরণকে তো সমর্থন জানাতেই হয়।

স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারণের স্বপ্নজাল বিস্তার করে তাঁদের মাধ্যমে বিনাবাধায় ধর্মান্তকরণের কাজ চলছে। শিক্ষিত উপজাতিভুক্ত বেকার যুবক যুবতীরা কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায় চাকরি চলে যাবার ভয়ে এই কাজে লিপ্ত হয়েছে।

দীপক লোহার, বয়স ৪৩। চেহারা ও শরীরের জীর্ণ দশা দেখে মনে হবে বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কাজ করেন ডানকানসের গ্যারগান্ডা বাগানে। ছেলে বুধরাই ডিসুজা সম্প্রতি বাগানে এসেছে। আমি তখন ক্ষেত্রসমীক্ষায় গ্যারগান্ডাতে কাজ করছি চা-শ্রমিকদের নিয়ে। ডানকানসের বাগানগুলির ভয়ংকর দশা। বুধরাইয়ের কাছ থেকে জানলাম রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে খ্রিস্টান হয়েছে সে। গ্র্যাজুয়েট বুধরাইয়ের শিক্ষা এবং চেতনার মানে সন্তুষ্ট হয়ে ডুয়ার্সের ধর্মান্তরকরণের 'মিশন ভিশন' এর লক্ষ্যে তাকে কাজ করতে বলেছে এনজিও গ্রুপ। বাড়িতে এসেই পরিবার পরিজন নিয়ে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে চার্চে ধর্মান্তকরণ হয়েছে দীপক লোহারের পরিবারভুক্ত সকলের। দীপকের ভাষায় 'যতক্ষণ গায়ে গতরে শক্তি আছে ততক্ষণ না হয় খাটলাম। কিন্তু একটু অসুস্থ হলেই তো কাজ করতে পারি না। সংসার চালানোই দায়। বাগান থেকে বলে কাজে যাও আর না পারলে নাম কাটাও। নাম কাটালে তো ৯৫ টাকা আর মাসে ৩৫ কেজি চালও পাবো না। এই টাকায় কীভাবে চারজনের সংসার চলে?'

গ্যারগান্ডা শ্রমিক মহল্লায় বান্দু লাইনে গায়ে গায়ে শ্রমিক বস্তি। একটাতেও ল্যাট্রিন নেই। হায়রে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প! লছমি লোহাড়ের সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে শাসক দলের শ্রমিক নেতা দোভাষীর কাজ করছেন। তাই তার মাধ্যমে লছমির সঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম। 'ডাক্তার দেখাননি?'

'—কীভাবে দেখাব? এখানে হাসপাতাল নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। জ্বর, সর্দি-কাশি, পেটের ব্যথা ছাড়া কোনও ওষুধ নেই। বেশি সমস্যার কথা বললে বলে হাসপাতালে যাও। এখান থেকে সরকারি হাসপাতাল মাদারিহাট। যেতে আসতে অনেক খরচ। বাগানে অ্যাম্বুলেন্স নেই। যেতে পয়সা লাগে, ডাক্তার পরীক্ষা করতে দেবে, টাকা কোথায় পাব? টাকা না থাকায় ওষুধ কিনতে পারি না, এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই অনেক ভাল।'

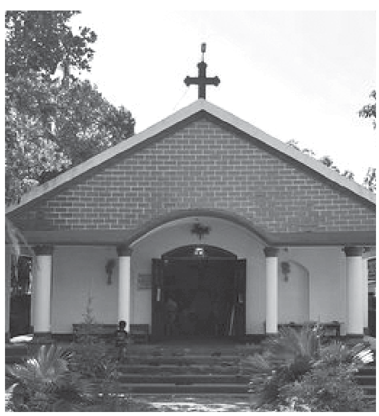

ডুয়ার্সের পরিচিত চার্চ

ওপরের বাঁদিক থেকে ডানদিকে পরপর

দক্ষিণ লাটাবাড়ি

জলপাইগুড়ি সেন্ট মাইকেল

মাঝের ডাবরি

সান্তালাবাড়ি

জলপাইগুড়ি ব্যাপটিস্ট চার্চ

শুধু দীপক লোহার বা লছমিদেরই জীবন জীবিকা এটা নয়। এ যেন সব চা-শ্রমিকের জীবনের নিয়তি। এদিন অন্তত ১০-১২ জন চা-শ্রমিকের সঙ্গে কথা হয়। তাদের কথায় উঠে আসে চা-শ্রমিকদের জীবনের এই বাস্তবতা। ডুয়ার্সে সেন্ট জেমস থেকে শুরু করে যে সমস্ত উন্নত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় রয়েছে প্রত্যেকটি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কমবেশি আদিবাসী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। এখন বাগানগুলিতে শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বাড়ছে। অনেকে ঋণ করে হলেও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে চান। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। কারণ যে জমিতে

চা-শ্রমিকেরা বাস করেন তা তাদের মালিকানাভুক্ত নয়।

এই জায়গাটাকেই ধরেছে খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থাগুলি। এনজিও-গুলিকে দিয়ে জনকল্যাণকর উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বাগিচা শ্রমিকদের উন্নয়নের টোপ দেখিয়ে ধর্মান্তকরণ চলছে বাগিচা থেকে বাগিচায়। নিঃশব্দে চলছে এই ধর্মান্তরকরণের কাজ। ভুখা শ্রমিক দু'বেলা পেট পুড়ে খেতে না পারলে কিসের ধর্ম, কিসের জাতি? অনাহার, দারিদ্র, অপুষ্টিতে জর্জরিত শ্রমিক বা চাকরি বা কামকাজ না পাওয়া যুবক যুবতীর কাছে যদি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বরাভয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের পেছনে যদি লাখো কোটি ডলারের তহবিল থাকে তাহলে তো নিজেদের পুরনো অস্তিত্ব বিসর্জিত হবেই। ধর্মীয় সত্তা এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের কথা যদি বলা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান হবার ফলে বিভিন্ন চা-বাগানে ধর্মীয় বা জাতিগত বৈচিত্র্য কখনওই সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। সমস্যাটা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, অপুষ্টি এবং শোষণের। অতএব বলা যায়, যা হয় তা মঙ্গলের জন্যই হয়।

আদিবাসী না উপজাতি? প্রশ্নটা এই জন্যই তুললাম যে তরাই এবং ডুয়ার্সের চা-বাগিচা বলয়ে বসবাসকারী সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা, নাগেশিয়া, মালপাহাড়ি, কোল ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোকে আদিবাসী বলব না উপজাতি বলব? এ প্রশ্ন বহুদিনের। অথচ জনমত আর সংবিধান কার্যত বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে। আদিবাসী জনগণকে প্রাথমিক পর্যায়ে জাতি, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, আদিম মানুষ, উপজাতি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হত। আদিবাসী শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা

> এমনকি মদ্যপানের প্রতি আসক্তিও কমছে। খ্রিস্টান চা-শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা উচ্চতর শিক্ষালাভ করছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। চা-বাগিচার দিশাহীন একঘেঁয়ে কাজের পরিবর্তে তারা শহরে বা গঞ্জে বাগিচাশ্রম বহির্ভূত বিকল্প পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে এবং অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করছে।

এবং তাদের অধিকার নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতর্ক প্রচুর,এমনকি জাতিসংঘেও। সে যাই হোক, অধিকাংশ চা-শ্রমিকেরা উপজাতিভুক্ত এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। যে সকল উপজাতিভুক্ত চা-শ্রমিকের ধর্মান্তরকরণ ঘটেছে তারা তাদের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাস, প্রকৃতিপুজো, শিকারী জীবন এবং কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছে। কুমারগ্রামদুয়ার বাগান, সংকোশ, নিউল্যান্ডস চা বাগানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি চিন্তা এবং চেতনার মানকে বিচার করে দেখতে গেলে এরা আশপাশের তুরতুরি, রহিমাবাদ ইত্যাদি বাগানগুলির শ্রমিকদের মানের থেকে অনেক উন্নত স্তরের। কারণ প্রথমত এদের বাগানগুলির শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রা অনেক উন্নতস্তরের, দ্বিতীয়ত বাগানগুলি বহুজাতিক কোম্পানীর এবং অধিকাংশেরই পরিচালকবর্গে এখনও ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জাতিগত প্রশ্নে তারা প্রায় সকলেই খ্রিস্টান। ফলে এদের পরিচালিত বাগানগুলিতে চার্চ বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু স্বার্থে কাজ করা এনজিও বা ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করা খ্রিস্টান শিক্ষাবিদেরা একটু বাড়তি সুবিধা পেয়েই থাকে। উদারণ হিসাবে বলা যায় সংকোশ বাগানে চার্চ তো আর এমনি এমনি প্রতিষ্ঠিত হয়নি? এর পেছনে অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলন তো আছেই।

তবে চার্চ স্থাপনের সুফলের দিকটাকে অস্বীকার করা যায় কি? অধিকাংশ উপজাতিভুক্ত চা-শ্রমিক কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। ভুতপ্রেত, তুকতাক, তাবিজ-কবচ-মাদুলি, ওঝা-গুণিন মানা নিরক্ষর মানুষগুলির নেই স্বাস্থ্য সচেতনতা, সমাজ চেতনা, জানে না শৌচাগারের ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা। পিতৃপুরুষ প্রদত্ত ধর্ম, গোঁড়ামি, অজ্ঞানতা, অন্ধকারের বদলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে তারা যদি আধুনিক ধ্যানধারণা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা, যুগোপযোগী শিক্ষা, লিঙ্গসমতা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরিচ্ছন্নতার শিক্ষালাভ করে তাহলে সেই ধর্মান্তকরণকে তো সমর্থন জানাতেই হয়। এইভাবেই উপজাতিদের মননে ধর্মান্তরিত উপজাতিদের আদবকায়দা, চালচলন, আর্থ-সামাজিক অবস্থান প্রভাব ফেলছে। এমনকি মদ্যপানের প্রতি আসক্তিও কমছে। খ্রিস্টান চা-শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা উচ্চতর শিক্ষালাভ করছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। চা-বাগিচার দিশাহীন একঘেঁয়ে কাজের পরিবর্তে তারা শহরে বা গঞ্জে বাগিচাশ্রম বহির্ভূত বিকল্প পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে এবং অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করছে। তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি স্বাবলম্বী অন্যান্য উপজাতিভুক্ত শ্রমিকদের চেয়ে। অধিকাংশ শ্রমিকই অর্থের গুরুত্ব বোঝে এবং দৈনন্দিন খরচটুকু বাদ দিয়ে বাকি অংশ সঞ্চয় করে যা তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে ম্যাকলয়েড রাসেল, গুডরিকস পরিচালিত বাগানগুলির ক্ষেত্রসমীক্ষায়; যেখানে দেখা গিয়েছে বাগিচা হাসপাতাল গুণগতভাবে উন্নতমানের, বাগিচার প্রাইমারি বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন নিয়মিত হয়। যদিও এইগুলির অধিকাংশই সরকারি, তথাপি অনুশাসন থাকে বাগিচা-শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা পড়ে বলে। একই প্রকার সামাজিক অগ্রগতি ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে ওরাওঁ এবং মুন্ডা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। ফলে খ্রিস্টান চার্চগুলি 'নব আদিবাসী সমাজ' তৈরি করছে বললে মোটেও অত্যুক্তি হয় না।

চার্চগুলির প্রধান লক্ষ্য আদিবাসীদের বা উপজাতিদের আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করা যা তারা শতকের পর শতক ধরে হারিয়ে এসেছে তাদের উপর আধিপত্য স্থাপনকারী গোষ্ঠীবর্গের দ্বারা। লক্ষ্যণীয় বিষয়, চার্চগুলি নিয়মিত সার্ভে এবং জনগণনা করে আদিবাসী জনসংখ্যার নিপুন প্রতিচ্ছবি রাখার জন্য। চার্চের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক সন্তানদের অদক্ষ শ্রমিক থেকে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত করা যাতে তারা সরাসরি ম্যানেজার বা চা-শিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজে নিযুক্ত হতে পারে। এইসকল চার্চগুলি এবং খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকেরা নিজস্ব এজেন্ট বা এনজিও-দের মাধ্যমে যে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করে সেগুলি হল উচ্চশিক্ষা, আদিবাসীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির পাঠদান, পরিবর্তনশীল আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। সচেতন ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা নিরন্তর সজাগ এবং সতর্কভাবে কাজ চালিয়ে যায়। আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর লক্ষ্যে চার্চগুলি সর্বদাই সক্রিয়। চার্চগুলি আদিবাসীদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করার শিক্ষা প্রদান করে থাকে যাতে রাজ্য রাজনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে তারা সঠিক নেতৃত্ব মনোনয়ন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জন, বারলা, তেজকুমার টোপ্পো, মনোজ টিগ্গা, কুমারী কুজুর, দশরথ তিরকী, মনোহর তিরকী, যোশেফ মুন্ডা, শুকরা মুন্ডা প্রমুখ উপজাতি

আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর লক্ষ্যে চার্চগুলি সর্বদাই সক্রিয়। চার্চগুলি আদিবাসীদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করার শিক্ষা প্রদান করে থাকে যাতে রাজ্য রাজনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে তারা সঠিক নেতৃত্ব মনোনয়ন করতে পারে।

সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃত্ব আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার উন্নতিবিধানে কাজ করে চলেছেন। জেমস কুজুর তফসিলী জাতি এবং উপজাতি দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী যাঁর নেতৃত্বে চলছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের অনেকেই কিন্তু চার্চের প্রভাবমুক্ত নয়।

আদিবাসী জনজীবন এবং জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আদিবাসী সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ, আদিবাসী সংস্কৃতির বিস্তার, আদিবাসীদের প্রিয় খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদের দিকেও লক্ষ্য রাখে চার্চগুলি। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান, বড়দিন বা গুডফ্রাইডের পাশাপাশি আদিবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক দিনলিপি বর্ণনার স্বার্থে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের স্বার্থে কাজ করে চলেছে চার্চগুলি। পাশাপাশিভাবে অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বিষয় আদিবাসী যুবতী এবং নারী শ্রমিকদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নেও কাজ করে চলেছে। প্রকৃত অর্থে চা-বাগান শ্রমিকদের ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সত্তা সবকিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষাগত দিকের কথাই যদি আমরা ধরি তাহলে দেখা যায় চা-বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে তিন ধরনের ভাষা প্রচলিত। মুন্ডা, হো, সাঁওতাল, খাড়িয়ারা 'কোলারিয়ান' অর্থাৎ কোল ভাষা গোষ্ঠীর, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায় হল ওরাওঁ, কোন্ত, গোদ, মালপাহাড়িরা। এছাড়া তৃতীয় সম্প্রদায় ওড়িয়া, বাংলা, হিন্দি অথবা অন্য ভাষায় কথা বলে। খুব কম সংখ্যক চা-শ্রমিক তাদের সাবেকি মাতৃভাষায় কথা বলে। মুন্ডা, খরিয়া, মাহালিরা মুন্ডারি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা ব্যবহার করে। যখন আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহার করে, অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় তারাই সাদরি ভাষায় কথা বলে যা চা-বাগিচায় কথ্য হিন্দিরই একটা বিশেষ রূপ বা 'গার্ডেন বাত'। সাধারণত শিশুরা তাদের নিজেদের মাতৃভাষা এবং সাদরি ভাষা দুটো ভাষাই শৈশবকাল থেকে শিক্ষালাভ করে। ভাষা ব্যক্তিবিশেষের সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যম। এর আলাদা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা অন্য ভাষা থেকে আগত কোনও ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা নয়। এটা ভাবা বাস্তবিকক্ষেত্রে একদমই ভুল যে সাঁওতাল জনজাতিভুক্ত গোষ্ঠীর ভাষা বাংলা বা হিন্দি ভাষাভাষীর থেকে উন্নত। কিন্তু প্রাইমারি বা আপার প্রাইমারি স্তরে পঠনপাঠনের মাধ্যম সাঁওতালী ভাষায় হবার স্বপ্ন কিন্তু প্রত্যেকটি সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষই দেখে। সুতরাং ভাষার সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ অতি অবশ্যই একটি জরুরি বিষয় বা ব্যক্তিবিশেষের সংস্কৃতিকে সুরক্ষা দেয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই বিষয়টিকেও খুবই গুরুত্ব দেন।

আসলে চা-বাগিচায় খ্রিস্টান চার্চের বিশেষত ক্যাথলিক চার্চের জনকল্যাণকামী রূপটিকে অস্বীকার করা যায় না। তাই ধীরে ধীরে চার্চের প্রতি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কাজ করা উচিত ছিল জনকল্যাণকামী সরকারের পঞ্চায়েতের বা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকবর্গের, সেই কাজ করছে চার্চগুলি। শিক্ষাবিস্তার এবং জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত হয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা যেভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

গৌতম চক্রবর্তী

গ্রামীণ পাহাড়-ডুয়ার্সে মুক্তির পথ বাতলাবে

ইকো টুরিজম

আবার শোষণের নয়া মুখোশ হয়ে না দাঁড়ায়!

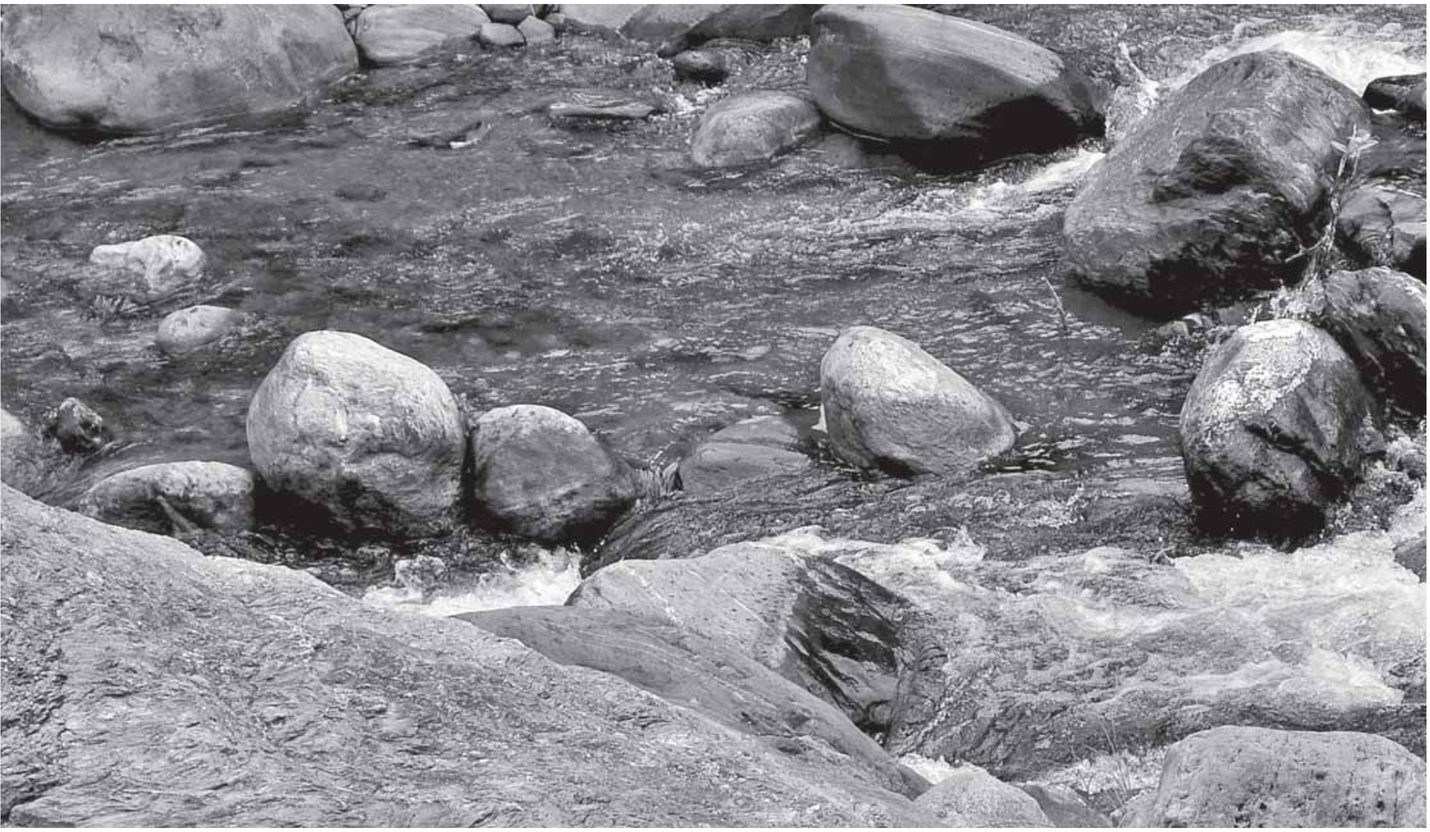

রিশিখোলা

গত সংখ্যায় শুরু হয়েছিল এই সফর, পর্যটকের অচেনার আনন্দ আর তার সঙ্গে সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে প্রতিবেদক গরুমারা থেকে পৌঁছে গিয়েছিলেন নেওড়াভ্যালি অরণ্যের গা ঘেঁষে কালিম্পংয়ের এক প্রত্যন্ত পাহাড়ি গাঁয়ে। ইকো পর্যটন নাকি হইহই করে শুরু হয়ে গিয়েছে উত্তরবাংলার পাহাড়ে? ইকো পর্যটনের আসল চেহারা ঠিক কীরকম তা এখনও বোধহয় পুরোপুরি ঠাহর করে উঠতে পারেনি দুনিয়া। তবে এটুকু স্বচ্ছ হয়েছে যে শিল্পহীন উত্তরের প্রান্তিক দরিদ্র মানুষগুলিকে উন্নত জীবনের পথ দেখাতে পারে! সত্যি যদি আংশিক ভাবে হলেও ইকোটুরিজম ভাবনা ও চর্চা শুরু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে এক নিঃশব্দ বিপ্লব আসন্ন। আবার সেটা না হয়ে সামান্য অনবধানতাকে প্রশ্রয় দিলে তা দুরাচারীর শোষণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আজ যাব রিশিখোলা, পাহাড়ি নদীর মৌতাত নিতে। চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল রাই পরিবারের সঙ্গে। এলাচ হয় এখানে খুব ভাল। তবে ভুট্টা, ধান এবং শাক-সবজির ফলনও মন্দ নয়। নেওরাভ্যালির বিশেষ প্রভাবে এখানে চার রকমের জলবায়ুর আনাগোনা। এই গ্রামের কিছু মানুষ এখনও ভুট্টা আর ধানের আঁশ থেকে বসার আসন বানাতে জানেন। যদিও সেই প্রথাগত শিক্ষায় মহিলাদের স্বনির্ভর করার কোনও উদ্যোগ নেয়। অদ্ভুত এক জায়গা! যেখানে গ্রামের রাই গোষ্ঠীর মানুষজন কী করবে আর করবে না, সেটা ঠিক করে দেবে হেল্প টুরিজম এনজিও আর তাদের বেড়ানো ব্যবসা জাঙ্গল ক্যাম্প? আর হরকা বাহাদুর ছেত্রি, কালিম্পংয়ে বসে দার্শনিক গাম্ভীর্যে মাঝে মাঝেই হাঁক পারবেন 'মমতা আমার দলে ভাঙন ধরাতে চায়'!

ডামসাং ফোর্ট

কালিম্পংকে নতুন জেলা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কেন? আপনি ভগবান হয়ে শহরে বসে থাকবেন আর কোলাখামে রাজপাট সামলাবে একটি এনজিও? হেল্প টুরিজম তো তাও ২০১২ সালে বিদেশের পয়সায় কোলাখামে প্রাথমিক স্কুল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু নতুন জেলা ঘোষণার পর আপনি কী করেছেন মাস্টারমশাই? জেগে উঠুন। সময় আর বেশি নেই যেদিন পরবর্তী প্রজন্ম প্রশ্ন করবে আপনাকে। লাতিন আমেরিকার রাগী কবি অটো রেনে কাস্তিওর মতো জানতে চাইবে ওরা— 'কী করছিলে তুমি যখন আমার মানুষ আর সভ্যতা নরমে গরমে মরে যাচ্ছিল? নিরুত্তর বাক্যহীন সেই মুহূর্তে শকুন নিস্তব্ধতা তোমায় গ্রাস করবে— মৃত্যুর মতো শীতল আর নির্মম।'

লাভা-পেডং হয়ে দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলাম রিশি নদীর ধারে ছোট্ট গ্রামে। যদিও গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধার দিয়ে হাঁটাপথে গ্রামের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল মারলেন। পিকনিক শেষে আবর্জনা সবাই নদীর ধারেই ফেলে গিয়েছে। এরা কারা? পিকনিক পার্টি নিশ্চয়ই কালিম্পংয়ের। তাহলে এর দায় কে নেবে? নদীর ধারে একটা মিষ্টি গ্রাম প্রতিদিন নষ্ট হবে অসভ্য কালচারে? পৃথিবীর গভীরতর অসুখ এখন— এটাই ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। গ্রামকে ভালবাসার স্বপ্ন শুরু হোক, গ্রামের মানুষকে পাশে নিয়ে। লোভ থেকে মনকে সরিয়ে ধীরে ধীরে লাভের পথে যেতে হবে। স্বনির্ভর করে তুলতে হবে গ্রামের মানুষকে। এই মানুষই যে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে সেটা পশ্চিমবঙ্গের থেকে ভাল আর কেউ জানে না।

রিশি নদীর স্নিগ্ধ জলে ধুয়ে যাচ্ছে মনের মলিনতা। পেডংয়ের বৌদ্ধমন্দির এবং প্রাচীন রেশমপথের প্রতি টান ছিল মারলেনের। কিন্তু পেডং থেকেই ভাবনার পরিবর্তন। আবার ফিরে যাব আমরা গ্রাম আর গ্রামীণ পর্যটনে। কাল যাব সিলেরি গ্রামে।

সিলেরিগাও বা সেলেরিগাও। এক সময়

সিলারিগাওয়ের শিশুরা

জায়গাটায় প্রচুর সেলেরি পাতার চাষ হত। সেলেরি থেকেই সিলেরি। এখন এলাচ ও আদার চাষ হয়। অনেক আগে ব্রিটিশ আমলে সিঙ্কোনার জঙ্গল ছিল এখানে। এলাকায় ঢুকেই অনেকগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল মারলেন। 'আচ্ছা জয়, এটা কি অনেকদিনের একটা গ্রাম নাকি পর্যটনের জন্য একটা গ্রাম বানানো হয়েছে?'

'একদম ঠিক। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণভাবে গড়ে ওঠা গ্রাম নয় এটা। সোজা কথায় শহরের বাইরে একটি প্রোমোটিং হয়েছে।'

'এবং সেটা হয়ে থাকলে গ্রামীণ পর্যটন বা ইকো পর্যটনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তোমার দেশে কি গ্রাম নেই যে গ্রাম বানিয়ে গ্রামীণ পর্যটন করতে হবে? উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও এমনটা হয় না। তোমার দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা কী বলে?'

'না, এটা দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কখনও দেখিনি আমি। এবং ওখানে ইকো পর্যটনের কোর এলাকায় গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। যা নিয়ে এখানে কোনও বিধিনিষেধ নেই।'

আলুর পরটা দিয়ে একটা সুন্দর প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। জঙ্গলের পথ ধরে যাব ডামসাং দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে। পাইন আর ধুপির জঙ্গল ধরে চার কিলোমিটার পথ যেতে যেতে দু'জনেই খুব খুশি হলাম। কেন না সাধারণ পর্যটক খুব একটা আসে না এই পথে। গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। হাঁটতে হবে। জঙ্গলের পোকামাকড় আছে। জঙ্গলের এই পথ এখন আদিম।

মারলেন পেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ। দুর্গে

মারলেন পেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ। দুর্গে পৌঁছে নিজের মনে ঘুরে বেরাচ্ছে এদিক ওদিক। এবং উত্তেজিত হয়ে পরছে প্রতিমুহূর্তে। একটা সময় আমরা গিয়ে বসলাম দুর্গের একটি ধারে। সামনে পাহাড় নিচে জনবসতি। 'আচ্ছা জয় দুর্গের গল্পটা একটু বল। দুর্গের ইতিহাস নিয়ে মানুষের মনে কি কোনও রাগ আছে। এমন ভাবে অবহেলায় পরে আছে কেন?'

পৌঁছে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ছে প্রতিমুহূর্তে। একটা সময় আমরা গিয়ে বসলাম দুর্গের একটি ধারে। সামনে পাহাড় নিচে জনবসতি।

'আচ্ছা জয় দুর্গের গল্পটা একটু বল। দুর্গের ইতিহাস নিয়ে মানুষের মনে কি কোনও রাগ আছে। এমন ভাবে অবহেলায় পড়ে আছে কেন?'

লেপচা রাজা গাব আচেওক-এর এই দুর্গ অনেক প্রাচীন। তিনি ছিলেন এই এলাকার শেষ লেপচা রাজা। আসলে শব্দটা তামসাং। এখন সবাই বলে দামসাং। এই দুর্গ থেকে সোজা পথে জেলেপলা পাস হয়ে তিব্বত যাওয়ার রাস্তা। লেপচা রাজার প্রাসাদও ছিল এই দুর্গে। সে সময় এই জায়গার নাম ছিল তামসাং, কালিম্পং নয়। তামসাং ছিল এক স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজার মৃত্যুর পর ভুটান দখল নেয় তামসাংয়ের। পরে ব্রিটিশের দখলে আসে। প্রতি বছর ২০ ডিসেম্বর লেপচারা এখন তাদের শেষ রাজার জন্মদিন পালন করে এখানে। সারাদিন ধরে চলে সেই উৎসব। ব্রিটিশদের লেখা ডুয়ার্স যুদ্ধের লেখায় বিস্তৃত বিবরণ আছে এই লেপচা রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের।'

মারলেন অবাক হয়ে বলল 'অদ্ভুত, এমন একটা ইতিহাস এরপরও এমন অবহেলা'!

সব সম্ভব মারলেন! আসলে এখানে পর্যটন নিয়ে সরকারের কোনও নির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। সেই সুযোগে কিছু দালাল সরকারি পয়সা নিয়ে ইকো ও গ্রামীণ পর্যটনের নামে টাকা নয়ছয় করছে। ব্যাপারটা অনেকটা 'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই'।

পরদিন রামিতে দারা যাওয়ার রাস্তায় গাছের-পাতার-মাটির গন্ধ মদির করে মনকে। কিন্তু এমন জায়গাতে গাড়ি নিয়ে কেউ গেলেও তাকে আটকানোর কোনও উপায় বা নিয়মনীতি কিছু নেই। খুব ভাল আবহাওয়ায় তিস্তা নদীর ১৪টি বাঁক পরিষ্কার দেখা যায়। এই শুদ্ধ পরিবেশেও কালিম্পং জেলা পিকনিক এবং যা খুশি তাই করার জন্য, দরজা খুলে রেখেছে। গোর্খাল্যান্ড ছাড়া বাকি সবকিছুই এখানে অবান্তর।

সেলেরিগাও থেকে ইছেগাও গাড়িতেও যাওয়া যায়। আবার হেঁটে যাওয়ারও রাস্তা আছে। গাড়িতে ১৫ কিলোমিটার এবং ৪০ মিনিট। আর জঙ্গলের পথে হেঁটে ৫ কিলোমিটার এবং ৩০ মিনিট। আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম গ্রামে। আসলে লেপচা গ্রাম কিন্তু লেপচাদের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। লেপচা ভাষায় ইছে (ইচ্ছে নয়) শব্দের অর্থ 'এলাকার সবচেয়ে উঁচু জায়গা'।

৫৮০০ ফুট উঁচুতে পাইন, বার্চ, জুনিপার আর রডোডেনড্রনে ঘেরা মিষ্টি গ্রাম। আমাদের থাকার বন্দোবস্ত 'খাওয়াশ' পরিবারে। এই প্রথম মনে হচ্ছে গ্রামের একটি পরিবারে তাদের বাড়িতেই আছি। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পরলাম। গ্রামের মানুষজন এবং গ্রাম যেন টানছে। নেশার টানে সমানে এগিয়ে চলেছি। কিছু বাড়িঘর নতুন হলেও এ গ্রাম হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। অনেকটা নিচে নেমে সড়কপথ। সোজা হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে একটি লেপচা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। বিদায় নেবার সময় কিছুতেই ছাড়বে না। খেয়ে দেয়ে যেতে হবে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে অল্প কিছু খেয়ে আবার সোজা হাঁটা। এবার পাহাড়ের মাথায় অনেক পাথরের ধাপ পেরিয়ে এক শিবমন্দির। উপরে উঠে খাওয়ার জলের খোঁজ করতে গিয়ে মারলেন এক সাধুর খোঁজ পেয়েছে, খুব ইচ্ছে আমি যদি একটু কথা বলি। প্রথমে রাজি না হলেও মারলেনকে খুশি করতে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরের পুজারি জানালেন, সাধু গত একমাস এখানে আছেন কিন্তু কথা বলেন না। আমি এগিয়ে যেতে সাধু স্মিত হাসলেন। বসতে বললেন। আমি প্রণাম জানিয়ে বললাম —আপনি কি মৌনব্রতে আছেন? সাধু মাথা নাড়লেন। —আপনি অনুমতি দিলে একটি কথা জানতে চাইব। সাধু মাথা নাড়লেন। —আচ্ছা এত মানুষ ধর্ম, রাজনীতি এবং মানবকল্যাণের নামে সারাদিন এত কথা বলছে। অনর্থক কথা বলছে আর আপনি একটাও কথা বলবেন না? সাধুর গোটা মুখ জুড়ে হাসি কিন্তু নিরুত্তর। আমার আর

> মন্দির থেকে বেরিয়ে মানসাংয়ের জলসা বাংলোর দিকে হাটছি। মুখে কোনও কথা নেই। কী বলতে চাইলেন সাধু? উনি কি মাটি মানে দেশ বোঝাতে চাইলেন নাকি মাটিই শ্রেষ্ঠ আসন বলে বোঝাতে চাইলেন? উনি কী বলতে চাইছিলেন 'মাটি ভালোবেসো। গোটা দেশ তোমায় ভালবাসবে।'

মারলেনের কাছে আপেল আর লাড্ডু ছিল। আমি সেগুলো হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —দেওয়ার মতো কিছু নেই আমাদের। শ্রদ্ধা স্বরূপ কিছু দিতে চাই। আপনি কি নেবেন? সাধু দু'হাত বাড়িয়ে লাড্ডু আপেল নিয়ে প্রণাম জানালেন। এরপর মন্দিরে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর নেমে আসব হঠাৎ দু'জন লোক এসে বলল —সাধুজি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

মন্দিরে উপনয়ন অনুষ্ঠান হচ্ছিল এক নেপালি পরিবারের। তারা সাধুকে চা আর কচুরি খেতে দিয়েছিল। তিনি ওদের ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, ওই দু'জন মানুষকে ডেকে নিয়ে এস। ওরা খেলে আমি খাব। আর আমাদের আপেল আর লাড্ডু তিনি বাচ্চাদের বিলিয়ে দিয়েছেন। মারলেনকে ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে বলতে, মারলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বহুক্ষণ। আমার দিকে ফিরল যখন ওর চোখ ভিজে গেছে।

চা-কচুরি খেয়ে প্রণামী হিসেবে ৫০০ টাকা সাধুকে দেব বলে হাত বাড়িয়েছি। সাধু আমার হাতটি ধরে ফিরিয়ে দিল প্রণামী। এবং এক চিমটে মাটি নিয়ে বুকে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে।

গোটা ঘটনায় আমরা দু'জনেই বিস্মিত।

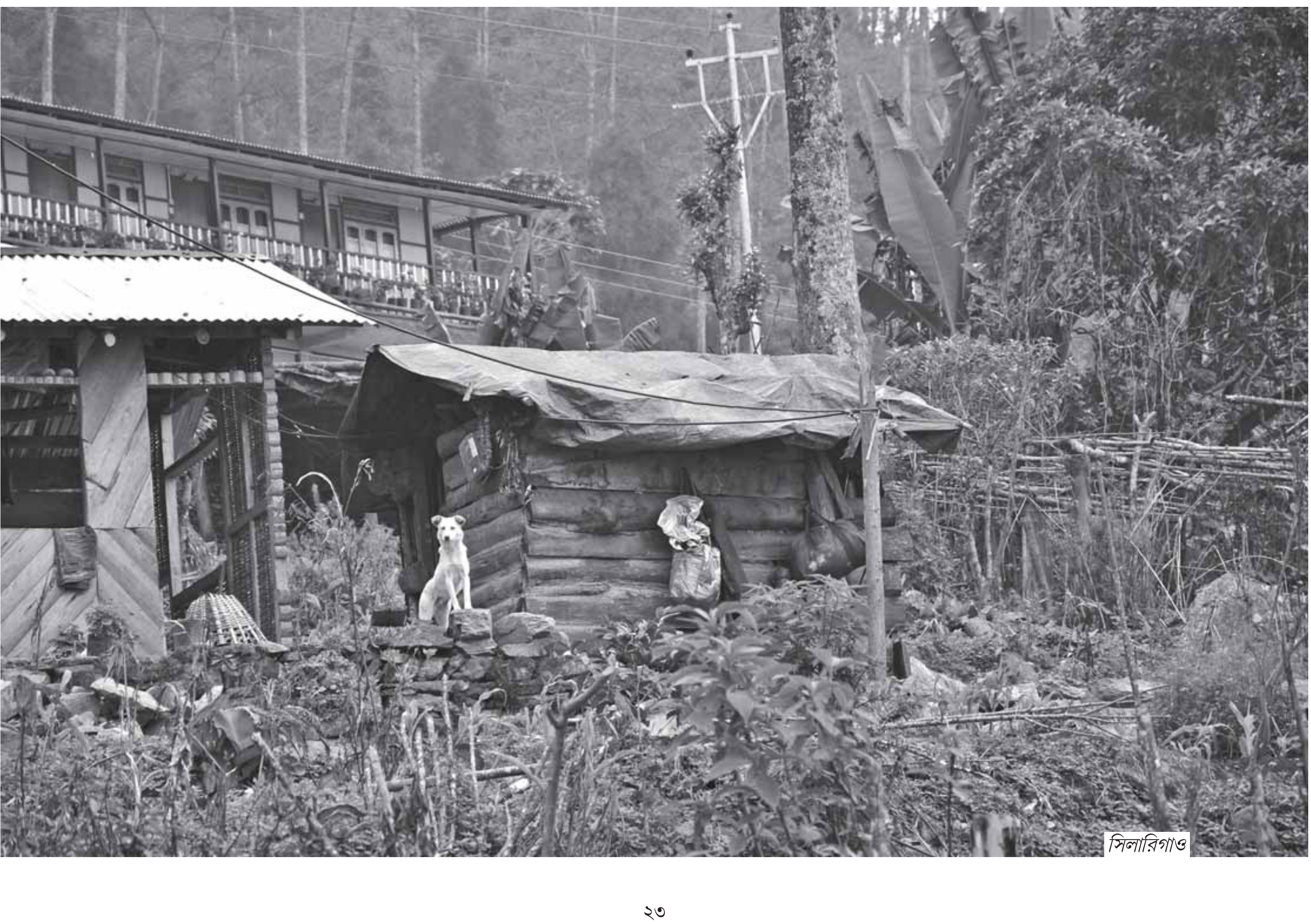

সিলারিগাঁও

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

এই ডুয়ার্সে কেউ বেড়াতে আসে না। কিন্তু জীবন প্রবাহ বয়ে চলে নিরন্তর। সেই প্রবাহে উজ্জ্বল মাছের মতো ভেসে ওঠে মানুষের ধর্ম। এই অপরিচিত, ব্রাত্য ডুয়ার্সে ঘুরতে ঘুরতে লেখক বুঝতে চেয়েছেন মাটির ছন্দ। ১লা জানুয়ারি সংখ্যা থেকে 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায় এখনকার ডুয়ার্সের টাটকা কাহিনি সেই ছন্দ থেকেই বেরিয়ে আসবে— যে কাহিনির সব চরিত্র অকাল্পনিক।

হতবাক। মন্দির থেকে বেরিয়ে মানসাংয়ের জলসা বাংলোর দিকে হাটছি। মুখে কোনও কথা নেই। কী বলতে চাইলেন সাধু? উনি কি মাটি মানে দেশ বোঝাতে চাইলেন নাকি মাটিই শ্রেষ্ঠ আসন বলে বোঝাতে চাইলেন? উনি কি বলতে চাইছিলেন 'মাটি ভালোবেসো, গোটা দেশ তোমায় ভালবাসবে'?

গ্রাম, গ্রামের মানুষ। গ্রামীণ পর্যটন, দেশ। দেশের মাটি। পরিবেশ, পরিকাঠামো সব কিছুকে এখনও বাঁচানো যায়, কিন্তু তার জন্য হাঁটতে হবে বহু পথ। রংরুট এবার সে কাজটাই করবে। এবং তার স্বার্থে কাউকে সমালোচনা করলে দয়া করে কিছু মনে করবেন না। এবং গ্রামের মানুষের স্বার্থে কোনও কিছু করতে অকুতোভয় আমরা। শুরু হোক চলার পথ —লেপচাদের পূণ্যভূমি, তামাংয়ের মাটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। একবার নয়। প্রতিদিন বারবার লিখব। রোজ লিখব। কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।

জয়ন্ত গুহ

PACKAGE TOUR 2018

Silk Route Tour (Siliguri to Siliguri)
Date of journey 21/01/2018
2 Nights 3 Days
Rs 5200/- per head

Andamans Package Tour (Port Blair to Port Blair)
Date of journey 19/05/2018
7 Nights 8 Days
Rs. 18950/- (per head)

Kerala with Kanyakumari (NJP to NJP)
Date of journey 17/10/ 2018
14 Nights 15 Days
Rs.23600/-(per head adults)

HOLiDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Jalpaiguri Off: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Rd. Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

চারপাশে চা-বাগান মাথার ওপর খোলা আকাশ

সেবার বসন্তে ডুয়ার্স গিয়েছিলাম। ছিলাম মাদারিহাটে আকাশিয়া রিসর্টে। প্রথমে নামটি শুনেই ভাল লেগেছিল। তারপর গিয়ে আরও মুগ্ধ হলাম। 'আকাশিয়া'— শব্দটির মধ্যেই মুক্ত নির্মল আকাশের ইশারা। বাস্তবেও তাই। চারপাশে চা বাগানের সবুজ উৎসব। রিসর্টের পিছনে খয়েরবাড়ির জঙ্গল। সামনে বিশাল লন। সেখানে সবুজ ঘাসের গালিচা।

দলগাঁও স্টেশন থেকে গাড়িতে রিসর্টে পৌঁছালাম। একতলা বাংলো প্যাটার্ন এই প্রাকৃতিক পরিবেশে খুবই মানানসই। ম্যানেজার সাদর অর্ভ্যথনা জানালেন। পূর্বদিকের ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। নরম কার্পেটে পা ডুবিয়ে এগিয়ে গেলাম ঘরে। রুচিসম্মত শৌখিন আসবাবপত্রে সুজ্জিত ঘর এবং বাইরে বসার জায়গাটি। ঘরের কাচের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একদিকে চা বাগান, অন্যদিকে জঙ্গল। চা বাগান এবং জঙ্গলের মেলবন্ধনই আকাশিয়াকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিছুক্ষণ পরেই গরম চা এসে গেল। চা খেতে খেতে জানালার বাইরে চোখ প্রসারিত করে দিলাম।

দুপুরে খাবার বিপুল আয়োজন দেখে একেবারে বিস্মিত। পশ্চিম দিকে খাবার ব্যবস্থা। বাড়িতে আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে একসঙ্গে এতরকম পদ খাওয়া হয়ে ওঠে না। এখানে ব্যস্ততা নেই। ছুটির আনন্দে সবরকম রান্না রসিয়ে রসিয়ে খেলাম। ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন। তাঁর আপ্যায়ন ও আন্তরিকতা আমার বড় প্রাপ্তি। খাওয়ার সময় এই অঞ্চলের নানা গল্প শুনছিলাম। বর্ষার পরে ধান ওঠার সময় হাতির আগমন হয়। আশেপাশেও চলে আসে, তবে রিসর্টের

জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কের ওয়াচ টাওয়ারে পর্যটকের ভিড়। ছবি ডাঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

কাচের জানালায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে পালায়। এখানে বর্ষাকাল দেখার মতো। নদীগুলি তখন ভরে ওঠে। মাছও পাওয়া যায় প্রচুর। গল্প শুনতে শুনতে আহারপর্ব ভালই কাটল।

পরের দিন ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরে। বেরিয়ে এলাম বাইরে। পুব আকাশে লালের ছোঁয়া। সূর্য উঠছে। সামনে সবুজ চা বাগান। এগিয়ে গেলাম চা বাগানের দিকে। চা বাগান পেরিয়ে এগিয়ে চললাম খয়েরবাড়ির জঙ্গলের দিকে। এখানে জঙ্গল তত গভীর নয়। হিংস্র জীবজন্তু নেই। আছে প্রচুর পাখি। তাদের কলকাকলিতে জঙ্গল মুখরিত। সকালটা দারুণ কাটল। ফিরে এলাম রিসর্টে। আজ যাব জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। আকাশিয়া থেকে অল্পকিছু দূরেই। জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে অরণ্য ভ্রমণ অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সেখান থেকে জয়ন্তী পাহাড় তারপর চিলাপাতা ফরেস্ট। চিলাপাতার জঙ্গল খুব ঘন। ময়ূর, বনমোরগ চোখে পড়ল। এখানেই তৃণভূমিতে দেখলাম গণ্ডারের লড়াই।

রিসর্টে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। আজ সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রকৃতির সান্নিধ্যে অদ্ভূত

রিসর্টের জানালায় বসে মেলে চা বাগানের অপূর্ব দৃশ্য

আনন্দের অনুভূতি জাগছে। রিসর্টে ফিরেও সেই আনন্দের রেশ রয়ে গেল। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। এরমধ্যে আরও টুরিস্ট এসেছে। তাদের সঙ্গে আলাপ হল। একটি পরিবার লাটাগুড়ি, বিন্দু-ঝালং হয়ে এখানে এসেছে। গল্পে গল্পে কেটে গেল সন্ধে। রিসর্টটিকে এখন বেশ জমজমাট লাগছে। রাতেও খাবারের এলাহি আয়োজন। পরের দিন সকালে আবার গেলাম খয়েরবাড়ি। খয়েরবাড়ির জঙ্গলের ওপাশে বুড়িতোর্সা নদী। সেখান থেকে গেলাম কুঞ্জনগর। দুপুরে রিসর্টে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে টোটোপাড়া ঘুরে এলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই এই আদিম উপজাতির বসবাস। ওপাশে ভুটান। আকাশিয়া থেকে ভুটানের একটি ছোট সুন্দর শহর ফুন্টসোলিং ঘুরে আসা যায়। কোথাও না ঘুরে চুপচাপ যদি রিসর্টেই বসে থাকতাম তাও সুন্দরভাবে সময় কেটে যেত। চা বাগান আর জঙ্গল নিয়ে আকাশিয়া অনবদ্য।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি বিশাল ব্যাপার। ফুলকো লুচি বেগুনভাজা, আলুর দম আর নানারকম মিষ্টি দিয়ে প্রায় দুপুরের খাবার আয়োজন। আজই চলে যাব। শুনলাম, আজ এখানে সন্ধেবেলায় আদিবাসীদের নাচগান হবে। খাওয়া-দাওয়ারও বিশেষ আয়োজন আছে। আমরা থাকতে পারব না ভেবে খুবই খারাপ লাগল। উদাসী মনটাকে আকাশিয়াতে রেখেই বেরিয়ে পড়তে হল।

ইন্দ্রানী ঘোষাল

আকাশিয়া রিসর্টে থাকা নিয়ে বিস্তারিত জানতে হলে ফোন করুন — হলিডেইয়ার, ফোন ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬।

নারী নির্যাতন বন্ধ হবে তারা সংগঠিত হলেই

আমাদের মতো যারা, সাধারণ মানুষের জন্য অর্থনীতির আলোচনাকে প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করেন— তারা মূলত নিজের অভিজ্ঞতাকে যুক্তি দিয়ে পরিবেশন করে থাকেন। আমার এক প্রিয় লেখক-কবি, হঠাৎ একটা মন্তব্য করে বসেছেন যে, আজকের প্রবন্ধকাররা সংবাদ পরিবেশন বা সাক্ষাৎকারের ঢঙে প্রবন্ধ রচনা করেন— বিশ্লেষণধর্মী লেখা নাকি কম দেখা যায়। আমি মনে করি সাংবাদিককে ঘটনার বহুমুখী চরিত্রের বিশ্লেষণ করতেই হয়— তাদের কলমে সবরকম সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় ফুটে ওঠে, বিতর্ক তৈরি হয়। আর আমরা সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রচনা থেকেই বহু দিকপাল মানুষকে চিনেছি। আইনস্টাইন থেকে পণ্ডিত রবিশংকর কত মণীষীকে নিয়ে সাক্ষাৎকার রচিত হয়েছে, তাদের জীবনের কথা আমরা জেনেছি।

আজকের প্রবন্ধের বিষয় এটা নয়। মাঝে আমার নির্দিষ্ট বিষয় থেকে একটু বিরতি নিয়ে কিছু অন্য কথা 'উত্তরপক্ষ'-এ লিখেছিলাম। ফিরে আসছি উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ জীবিকা ও আর্থসামাজিক অবস্থার বিষয়ে।

গত তিন-চার দিন মনের মধ্যে গভীর বেদনা ভারতের সমস্ত সংবেদনশীল মানুষের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে, ভাবনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিছু অসহিষ্ণু বর্বর

ব্যাঙ্কের পরিষেবার জন্য অপেক্ষায় দলের মেয়েরা

চিংড়ি মাছে ফুলকফি

উপকরণ: একটা ফুলকফি মাঝারি সাইজ করে কাটা, আলু ডুমো করে কাটা পরিমাণ মতো, মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ ২৫০ গ্রাম, টম্যাটো ১টা পুরিয়ে বাটা, পেঁয়াজ ১টা মাঝারি সাইজের ভেজে বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা পরিমাণ মতো, ১ চা-চামচ জিরে বাটা, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, হলুদ হাফ চা-চামচ, গরম মশলা ১ চা-চামচ, সম্বারের জন্য সামান্য জিরে কয়েকটা তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা, ১ চা-চামচ চিনি ও স্বাদ অনুযায়ী লবণ।

প্রণালী: ফুলকফির টুকড়োগুলি লবণ হলুদ জলে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন, কড়াইতে তেল দিয়ে প্রথমে আলু ও চিংড়ি মাছ আলাদা করে ভেজে রাখুন, এবারে তেলে জিরে শুকনো লঙ্কা ও তেজপাতা ফোড়ন দিন তারপর ফুলকফিগুলি দিয়ে দিন সঙ্গে হলুদগুঁড়ো একটু লবণ দিন ও কম আঁচে ঢেকে সেদ্ধ হতে দিন, ৩/৪ মিনিট পর আলুগুলো দিয়ে দিন, তারপর জিরে বাটা পোড়া টাম্যাটো বাটা, ভাজা পেঁয়াজ বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে খুব ভাল করে কষাতে থাকুন। কষানো হয়ে গেলে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিন ও অল্প জল দিন ও স্বাদ অনুযায়ী চিনি দিন। ভাল করে ফুটে ওঠে ও একটু মাখো মাখো হলে গরম মশলা দিয়ে ঢেকে আঁচ বন্ধ করে দিন, গরম ভাত রুটি লুচি সবের সঙ্গে এই পদটি ভীষণ জমে যাবে।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

মানুষ— ক্রমাগত গরীব মানুষের উপর অত্যাচার করে চলেছে। এবার রাজস্থানে যেভাবে কালিয়াচক, মালদহের আফরাজুলকে কুপিয়ে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে— বার বছরের শিশুকে দিয়ে ভিডিয়ো করা হয়েছে— এ ঘটনা সমস্ত বর্বরতার সীমা অতিক্রম করেছে। 'লাভ জেহাদ' নিয়ে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম সরগরম।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বলছে কলকাতা ভারতবর্ষের মহানগরগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ। উত্তরবঙ্গের ছোট শহরগুলির খতিয়ান জাতীয় রেকর্ড বুকে লিপিবদ্ধ হয় না— দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি শুধু কলকাতা মহানগরী নয়— কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির মতো শহরে অনুষ্ঠান সেরে মহিলারা রাত করে নিরাপদে বাড়ি ফিরছেন। ভাবনাটা মোটেই রোমান্টিক কিছু নয়। আমরা জানি এর ভেতরেও লুকিয়ে আছে এক চরম মর্মান্তিক সত্য। নারী পাচার এবং গৃহকর্তা/কর্ত্রী দ্বারা স্ত্রী নির্যাতনে (ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স) পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষে প্রথম স্থানে। নারী পাচারের ক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্য প্রথম স্থানে। জেলাগুলির মধ্যে নারী পাচারে জলপাইগুড়ি জেলার নাম প্রথম দিকে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনায় শিশু পাচারকারীদের পাকড়াও করা হয়েছে এবং তা নিয়ে বিস্তর হৈ চৈ হয়েছে। এই 'লাভ জেহাদ' জনিত নৃশংসতা, নারীর উপর পারিবারিক অত্যাচার, অ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া, জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা— এসব বন্ধ করতে হলে একটা শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা, যারা নারীর অবস্থা এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। প্রায় ১৩০ কোটির দেশে এটা আকাশকুসুম মনে হতে পারে তবে সচেতনতাই নারীর মুক্তির পথ।

তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারে বা আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারেও নারীর উপর অত্যাচার দেখা যায়। বহুদিন আগে শ্রীমতি কিরণ বেদী বলেছিলেন নারীর উপর অত্যাচার চলছে জেনেও সমাজ তার মোকাবিলায় এগিয়ে আসে না। অত্যাচারিতার পিতৃগৃহেও সমালোচনার ভয়ে তেমন জোরদার প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না। একসময় সেই কন্যাকে হত্যা করা হলে থানায় দায়সারাভাবে অভিযোগ জানিয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ করে। এদেশে নতুন শব্দবন্ধ তৈরি হয় 'অনার কিলিং'— সম্মানরক্ষায় হত্যা। নারী— অর্দ্ধেক আকাশ, মা দুর্গা— মা কালী রূপে পূজিতা— আবার ফিল্মের দামিনীও নারী। ধূপগুড়ির সেই মেয়েটা— যে সালিশীর নামে অত্যাচার মানেনি, শিরোধার্য করেছিল মৃত্যু পরোয়ানা— সেও নারী।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে নারীশক্তিই। তারা সচেতন হলে সংঘবদ্ধ হলেই এই অন্যায়— এই অত্যাচার— বর্বরতা বন্ধ করা সম্ভব। এর একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অধ্যাপক ড. মহম্মদ ইউনিস। তিনি গ্রামের মহিলাদের নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা গ্রুপ তৈরি করেছিলেন, সেই আশির দশকে। আমাদের দেশে কর্ণাটকে একইরকম ভাবে ১০-২০ জন গরীব মানুষকে নিয়ে স্বনির্ভর দল তৈরি শুরু হয় নব্বই দশকে। নাবার্ড এবং পরবর্তীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বনির্ভর দল বা সেলফ হেল্প গ্রুপের ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ জারী করে। তখন সারা ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চালু ছিল— আই.আর.ডি.পি.। অর্থাৎ সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প— ইংরেজিতে ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

১৯৯৯ সালের ১ এপ্রিল তারিখে আই.আর.ডি.পি. ছাড়াও আরও কিছু গরীব মানুষদের জীবিকা উন্নয়নের প্রকল্প একত্রিত করে 'স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' বা এস.জি.এস.ওয়াই. প্রকল্প চালু হয়। ১০ থেকে ২০ জন গরীব মানুষ যাদের বি.পি.এল তালিকায় নাম ছিল তাদের একত্রিত করে এস.এইচ.জি. বা স্বনির্ভর দল তৈরি শুরু হয়। এটাও বলা হয়, দলে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত সদস্য থাকতেই হবে। বাকি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত এ.পি.এল হলেও চলবে। গ্রামে রাজনীতি করার সুবিধাজনক হাতিয়ার ছিল বি.পি.এল. তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার— কাজেই যারা স্বনির্ভর দল করলেন তাদের অনেকেই গরীবের দলে পড়েনি। অনেক গরীবও বাদ পড়েছে তালিকায়।

প্রাথমিকভাবে দলগঠনের কাজে

মহিলাদের সচেতনতা শিবির

পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছিল না— অনেকেই দল গঠনের প্রথম মিটিঙে বলত— 'দলটা ছ' মাস চললেই অল্প টাকা আর এক বছর চালালেই প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে'। গরীব মানুষের বিশেষত সমাজের দমচাপা পরিবেশে যে নারীরা আছেন, তাদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারটাই বোঝানো হয়নি। শিশু ও নারীদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, নারীর অধিকার, সামাজিক কুসংস্কার, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা এবং পরিশেষে স্থায়ী রোজগার— সবই অবহেলিত থাকল। পুরুষদের বহু দল তৈরি হল, তারা নানা কৌশলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ আদায় করল এবং ঋণ পরিশোধ না করে স্বনির্ভর আন্দোলনকে বড় ধাক্কা দিল। অথচ সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল— যেহেতু গরীব পরিবারের মহিলারা অনেকটাই পিছিয়ে, কাজেই দল তৈরির ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারের এই অভিপ্রায় বহুক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছিল। তাছাড়া পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ, গ্রামে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল কর্মী স্বনির্ভর দলের দেখভাল করবে বলে ভাবা হয়েছিল। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর দলের সদস্যদের প্রকল্প গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল, যাতে তাদের রোজগারের স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায়। এমনকি স্বনির্ভর দলের তৈরি হস্তশিল্প, প্রাত্যহিক ব্যবহার্য সামগ্রী, কাপড় বা পোশাক বিক্রির জন্য সরকার সাহায্য করতে চেয়েছিল। ভাবনা ছিল বৈপ্লবিক— কিন্তু যাদের উপর এসব কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল— তারা ছিল একান্তই অপরিপক্ক। প্রায় দশ বছর অতিক্রম করার পর সরকার প্রকল্পটির 'অভিঘাত পর্য্যালোচনা' (ইমপ্যাক্ট অ্যানালিসিস) করে বুঝলেন প্রকল্পটির খোল নলচে না পাল্টালে সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে। তারা উপলব্ধি করলেন বি.পি.এল (বিলো পভার্টি লাইন)-এর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অকেজো— বি.পি.এল-এর বাধ্যবাধকতা লোপ করা হল।

এবার খোল নলচে পাল্টে, দারিদ্র দূরীকরণের নতুন প্রকল্প চালু করা হল— নাম করা হল এন.আর.এল.এম. (ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন) হিন্দিতে 'আজিবিকা'। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এন.আর.এল.এম. প্রকল্পের এই রাজ্যে উদ্বোধন করেন ১৭ মে, ২০১২ তারিখে এবং বাংলায় নামকরণ করেন 'আনন্দধারা'। সেই ১০ থেকে ২০ জনের দল থাকল। এস.ই.সি.সি. (সোসিও ইকনমিক কাস্ট সেন্সাস)-এ যে পরিবারগুলো গরীব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই সমস্ত পরিবারকে এন.আর.এল.এম.-এর আওতায় এনে স্বনির্ভর দলভুক্তি করা হবে। শুধুমাত্র মহিলারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। মিশনের মতো ডেডিকেটেট বা 'নিবেদিত প্রাণ' কিছু কর্মীর গুচ্ছ তৈরি করা চলছে। ব্লকগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে— (ক) ইনটেনসিভ (সর্বব্যাপী) (খ) নন ইনটেনসিভ ব্লক। ইনটেনসিভ ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্বনির্ভর দলের তথ্য রাখা, ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ, সংগঠন তৈরি ইত্যাদির জন্য তিনজন সি.এস.পি (কম্যুনিটি সার্ভিস প্রোভাইডর) নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিটি গ্রামসংসদে সাব ক্লাসটার (উপসংঘ) এবং প্রতিটি দল থেকে একজন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তৈরি করা হয়েছে ক্লাস্টার। কিছু ব্লকের সবগুলো ক্লাস্টার মিলে হয়েছে ফেডারেশন বা মহাসংঘ। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ২টি মহাসংঘ আছে এবং দিনহাটা ব্লকে (কোচবিহার জেলা) একটি মহাসংঘ আছে। ইনটেনসিভ ব্লকে গড়ে চারটি সংঘ দেখাশোনায় নিযুক্ত আছে এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, ব্লকে আছে ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজার, সংঘ স্তরে আছে সংঘ কো-অর্ডিনেটর ও তিনজন সি.এস.পি।

মহিলারা দূরে গিয়ে অর্থাৎ ব্লক বা জেলায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। রাতে দলবেঁধে হস্টেলে থাকছেন। ওদের ভাষা এবং চলাফেরায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। ওদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অল্প— তাই লেনদেন শেখানোর জন্য সরকার ইনটেনসিভ ঊব্লকে ১৫ হাজার টাকা 'প্রগতি ফান্ড' দিচ্ছে।

স্বনির্ভর দলের জোরদার সংগঠন তৈরির নির্দেশিকা মূল প্রকল্পে স্থান পেয়েছে। উপসংঘ থেকে মহাসংঘ এবং তাতে নিযুক্ত কর্মীরা প্রত্যেকের প্রাথমিক দায়িত্ব স্বনির্ভর দলের ক্ষমতায়ন অর্থাৎ তাদের সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাতে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দলগুলো সক্ষম হয়।

আনন্দধারায় রাজ্যস্তরে তৈরি হয়েছে স্টেট মিশন মনিটরিং ইউনিট, জেলায় গঠিত হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট মিশন মনিটরিং ইউনিট (ডি.এম.এম.ইউ), ব্লক স্তরে আছে ব্লক মিশন মনিটরিং ইউনিট (বি.এম.এম.ইউ)

নতুন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ এবং স্বনির্ভর দলের সংগঠন অর্থাৎ উপসংঘ, সংঘ বা মহাসংঘগুলিকে জোরদার করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

'পঞ্চসূত্র' বা পাঁচটি নীতি/নিয়ম পালনের কথা দলগুলিকে বলা হচ্ছে যেমন (ক) নিয়মিত মিটিং (খ) নিয়মিত সঞ্চয় (গ) সদস্যদের ঋণ দেওয়া (ঘ) ঠিক মতো ঋণ পরিশোধ করা এবং (ঙ) খাতাপত্র ঠিক রাখা।

এদিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে দলগুলো কীভাবে চালনা করতে হয়। প্রতিটি দলের একজন দলনেত্রী এবং কোষাধক্ষ্য থাকছে। কোনও কোনও দলে একজন সভানেত্রীও থাকেন। নিয়মিত সভা বলতে মাসে চারটি সভার কথা বলা হয়েছে। সেখানে সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, শিশু ও মাতার স্বাস্থ্য বা শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা খাতায় লেখা হয়। খাতাটিতে উপস্থিত সদস্যদের সই এবং শেষে সভার সভাপতি স্বাক্ষর করেন। ওরা প্রতি মাসে প্রতি সদস্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দলের কাছে সঞ্চয় করেন। ওই টাকা সঞ্চয় খাতায় লেখা হয় এবং ব্যাঙ্কে জমা করা হয়। প্রয়োজনে সদস্যরা ওই টাকা থেকে ঋণ নেন এবং পরিশোধ করেন নিয়ম মেনে। ঋণ খাতায় সে সব হিসাব লেখা হয়। খুব অল্প সুদ দিতে হয়। সামান্য টাকার ঋণ সাধারণত ছয় মাসে শোধ করা হয়। খাতাপত্র রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ চলছে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন— স্বল্প শিক্ষিত বা অক্ষর জ্ঞানহীন সদস্যরাও আছেন। তবে খাতাপত্র খুব সহজ পদ্ধতিতে রাখা হয়। অনেক স্বল্প শিক্ষিতা সদস্যাকে দেখেছি— কী সুন্দর খাতাপত্র রাখছেন।

মহিলারা দূরে গিয়ে অর্থাৎ ব্লক বা জেলায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। রাতে দলবেঁধে হস্টেলে থাকছেন। ওদের ভাষা এবং চলাফেরায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। ওদের সঞ্চয়ের পরিমাণ অল্প— তাই লেনদেন শেখানোর জন্য সরকার ইনটেনসিভ ব্লকে ১৫ হাজার টাকা 'প্রগতি ফান্ড' দিচ্ছে, নন-ইনটেনসিভ ব্লকে একই পরিমাণ টাকা 'রিভলভিং ফান্ড' দিচ্ছে— ওই টাকা ফেরত দিতে হয় না, দলের সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা হয়। দলে মিটিংয়ে রেজুলেশন করে ওই টাকা তুলে সদস্যদের ঋণ দেওয়া হয়। লেনদেনের অভ্যাস করে গ্রেডিং বা মূল্যায়ন হয় দলের— এবার ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায়।

এখন সমস্যা হলে ওই গরীব মহিলারা গ্রামপঞ্চায়েত, ব্লক বা জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলছেন, সমস্যার সমাধান করছেন। আগামীতে তাদের জীবিকা উন্নয়নের কথা আলোচনা হবে।

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

অপর্ণার দিনরাত্রি পাল্টায়!

অপর্ণার দিনগুলো কি পানসে হয়ে যাচ্ছে? রাতগুলো? ইদানিং চকিত তরঙ্গের মতো এই চিন্তাটা মাঝে মাঝে বিব্রত করে, বিমর্ষ করে অপর্ণাকে। অথচ মেয়ে তিতলির ভাল বিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে এখন সে বিদেশে সেট্‌ল। ছেলে বান্টি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের থার্ড ইয়ার, ভাল কলেজ। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আর্থিক, সামাজিক বা পারিবারিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও খামতি নেই কোথাও তবু... তবু একটা আনচান করা অসুখী আবেশ জড়িয়ে ধরে কেন বারবার? কী নেই বুঝতে পারে না। তবু হঠাৎই একটা না থাকা শূন্যতা চমকে দিয়ে, বিমর্ষ করে দিয়ে যায়। স্বামী সৌগত ব্যস্ত মানুষ, সরকারের উচ্চপদের আধিকারিক। সময় কম পান পরিবারের জন্য কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা বা টান এখনও সতেজ। আর কী চাইতে পারে মানুষ জীবনের কাছে? আর কী চাইবার আছে? নিজেকে প্রশ্ন করে অপর্ণা। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে। তবুও নিস্তার পায় না বোধের ভিতর লুকিয়ে থাকা ওই কালো শূন্যতার হাত থেকে।

প্রচুর পত্রপত্রিকা পড়ে অপর্ণা। ছাপার অক্ষরে পাওয়া কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয় সে কি বিষাদ রোগে আক্রান্ত? ডিপ্রেশন? এটা ভেবেই আরও বিষাদ গ্রাস করে তাকে। গুটিকয় পুরনো বান্ধবীদের মধ্যে কলেজের সুচিত্রার সঙ্গেই এখনও নিয়মিত যোগাযোগ অপর্ণার। সুচিত্রাকে নিজের আশঙ্কার কথা ফোনেই বলে অপর্ণা। সুচিত্রা ফোনেই তুড়ি মেরে ওড়ায় অপর্ণার আশঙ্কার ভীতিকে। বলে এটা টিপিক্যাল হাউজওয়াইফদের মিডল এজ ক্রাইসিস। সুচিত্রার অনুরোধেই পরদিন বিকেলে বেরিয়ে পরে অপর্ণা ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

সন্ধের মুখে ওকে একটা বাড়িতে নিয়ে ঢোকে সুচিত্রা। এটা ওদের একটা ক্লাব। পুরনো দিনের বাড়ির একটা খোলামেলা বড় নিচের তলার ঘর আর তার ছড়ানো ছিটানো বসার জায়গায় জনা বিশেক মহিলা। মহিলাদের ক্লাব শুনেই অপর্ণার একটু অস্বস্তি হয় প্রথমে। কিন্তু বিপাশা, গার্গী, কাকলি, মল্লিকাদের সঙ্গে আলাপ করে অভিভুত হয়ে যায় অপর্ণা। ওরা জনা বিশেক বিভিন্ন বয়সের শিক্ষিতা আধুনিকা মহিলা এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপর্ণাকে আপন করে নিল এত সহজেই যে অপর্ণার এখানে আসার সময় যে অস্বস্তি ছিল সেটা কোথায় যেন উবে গেল। এরা প্রত্যেকেই নিজেদের পারিবারিক সমস্ত দায়দায়িত্ব সেরে নিজেদের ফাঁকা সময় এই ক্লাবকে দেয়। মল্লিকা তার অটিস্টিক বাচ্চাকে সামলে যেটুকু সময় পায় এখানে চলে আসে। গার্গী সিঙ্গল মাদার। বহু লড়াই করে সে তার একমাত্র মেয়েকে মানুষ করছে। এখন মেয়ে স্কুল শেষ করে কলেজে ঢুকেছে, তাই গার্গীর নিজস্ব সময় কিছুটা বেশি; সে চলে আসে বিকেলের আগেই। অপর্ণা খেয়াল করল অনেকেই নিজের সমস্যার কথা শেয়ার করছে এখানে কেউ আবার হাসতে হাসতেই সেটার সুন্দর সমাধান বাতলে দিচ্ছে। কারও সেই সমাধান পছন্দ হচ্ছে না সে তর্ক জুড়ছে, তখন কেউ লঘুচালে হাসিমস্করা করে পরিস্থিতি হালকা করে দিচ্ছে।

ওরা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের মায়েদের একটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে কিছুদিন হল, সাধ্যমতো চাঁদা তুলছিল সেদিন, ওদের যতটুকু হয় সাহায্য করে পাশে দাঁড়ানোর জন্য। অপর্ণার কাছে কেউ চায়নি কিন্তু ও স্বতপ্রণোদিত হয়েই কিছু টাকা ওদের হাতে তুলে দিল। বেশ ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে অপর্ণা যখন বাইরে আসল তখন অদ্ভুত একটা অন্যরকম অনুভূতিতে মনটা বদলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ একটা বদ্ধ ঘরে থাকবার পর একটা খোলামেলা বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর যে অনুভূতি এটা মনে হয় এইভাবেই তুলনা করা চলে।

ধীরে ধীরে অপর্ণা ওদের দলে সামিল হয়ে গেল। দিনকতক কাটার পর অপর্ণা যেন বুঝতে পারে জীবনে সমস্যা না থাকাটাও একটা সমস্যা।

মানুষের জীবনে সম্পন্নতা, নিশ্চিন্ততা বা সুখই শেষ কথা নয়। হয়ত কবির কথায় বিপন্ন বিস্ময় সত্যিই রক্তের ভিতর খেলা করে। গতানুগতিক সুখের ভার হয়ত গভীর থেকে ভারাক্রান্ত করে ফেলে মনকে। মল্লিকা, গার্গী, তপতীদের সমস্যাগুলিকে অপর্ণা যেন অজান্তেই আপন করে নেয়। নিজের মনের ভিতর চলতে থাকা সমাধানের, বিশ্লেষনের পথ খোঁজা। কাউকে ভাল ডাক্তারের রেফারেন্স দিয়ে, সৌগতকে বলে কারও আটকে থাকা কোনও কাজের সুরাহা করে দিয়ে অপর্ণা যেন নতুন করে নিজের জীবিত অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

চন্দ্রাশ্রী মিত্র

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

তরঙ্গ উত্তরঙ্গ

৫৯

বজরা থেকে চরে নামার জন্য তক্তা পাততে হবে। তিনজন মাঝি ঝুপ ঝাপ জলে লাফিয়ে পড়ল। বজরা ঘেঁসে প্রায় ডুব জল থাকলেও চরের গোড়ায় তা কমে হয়েছে হাঁটুর একটু ওপরে। পা যাতে পিছলে না যায় তাই তক্তার গায়ে আড়াআড়ি ভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে কাঠের টুকরো। বজরার উচ্চতা থেকে তক্তা বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে গগনেন্দ্র বুঝল হাতে কিছু থাকলে সে পড়ে যেতে পারে। বীরেনের হাতে রাইফেল। অস্ত্রের ব্যাগটা গগন নিয়েছে নিজের হাতে। সেটা মাঝিদের হাতে দেওয়া যাবে না। সে একটু অসহায় ভাবে তাকাল তারিনী বসুনিয়ার দিকে। তিনি সমস্যাটা বুঝে ব্যাগটা হাতে নিয়ে মসৃণ ভাবে নেমে গেলেন পাতাটন বেয়ে।

'ভোরের আলো ফোটার আগেই ফেরার চেষ্টা করবে।' গগনেন্দ্র নিচে নেমে এলে তাঁর হাতে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন তিনি। তারপর মাঝিদের হুকুম দিলেন পেট্রোম্যাক্স নিভিয়ে দেওয়ার জন্য। সেটা নিভে যেতেই চাঁদের আলো মেশান অন্ধকার ঝপ করে ঘিরে ফেলল তাঁদের। চরটা হলদে আলোয় পরিষ্কার বোঝা গেলেও তার পর কী আছে বোঝা কঠিন। জমাট বাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। নদীর দিকে তাকালে খালি কুয়াশা। নিরাপদ বর্মনের পেছন পেছন ওরা দু-জন এবার হাঁটা শুরু করল। পাড়ে উঠে বোঝা গেল একটা হালকা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে তাঁদের।

'এদিকে জনপদ নেই?' গগনেন্দ্র জিগ্যেস করল।

'আছে। তবে আমরা জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছি।'

খানিকটা হাঁটার পর জঙ্গল গভীর হতে শুরু করল। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো অতি সামান্যই আসছিল। কয়েক হাত আগে থাকা নিরাপদ বর্মনকে মনে হচ্ছিল ছায়া দিয়ে তৈরি কোনও মানুষ। তবে পথ যতটা খারাপ হবে বলে ওরা ভেবেছিল, ততটা নয়। কোথাও কোথাও জলকাদা জমে থাকা ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। গাছগাছালি ঘন হয়ে আসলেও সরু একটা পায়ে চলা পথের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল ছায়ামাখা জমিতে।

গগনেন্দ্র এবার নিজের উত্তেজনাটা অনুভব করল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দ হচ্ছে। উপেনের সঙ্গে দেখার হওয়াটা যে স্রেফ কিছু সময়ের অপেক্ষা, সেটা বিশ্বাস করতে পারছিল সে। কিন্তু ঘন হয়ে আসা অরণ্যের ঠিক কোথায় সে থাকবে— সেটা স্পষ্ট হচ্ছিল না তাঁর কাছে। বার বার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো উপেন।

সামনে জমে থাকা অন্ধকারে হঠাৎ বাড়তি আলোর আভা এসে লাগল যেন। একটু পরেই বোঝা গেল সামনে একটা ফাঁকা জায়গা। চাঁদের আলো সেখানে প্রায় বাধাহীন ভাবে পড়েছে। নিরাপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী হলো?' উদ্বেগের সুর ফুটল বীরেনের

গলায়। 'এনিথিং রং?'

নিরাপদ কোনও জবাব না দিয়ে একটা শিস দিল। মনে হলো একটা পাখি ডেকে উঠল জঙ্গলে। কয়েকে সেকেন্ড পর ফাঁকা জমিটার দিক থেকে ভেসে এলো হুবহু একই রকম একটা শিস।

'ওরা সঙ্কেত দিয়েছে।' স্বস্তির সুরে জানাল নিরাপদ। 'চলুন। ওই জমিটার দিকে।'

কয়েক পা এগোতেই যেন অন্ধকার ফুঁড়ে তিনটি মূর্তি উঠে দাঁড়াল তাঁদের সামনে। মলিন চন্দ্রালোকে তাঁদের একজনকে চিনে ফেলতে তিলমাত্র দেরি হলো না গগনেন্দ্রর। সেই মুখ। সেই হাসি।

গগনেন্দ্র কিছু বলতে পারল না। কেবল তাকিয়ে থাকল। এই তো উপেন! তাঁর কয়েক হাতের মধ্যে! ধুতি শার্ট পরা। গায়ে চাদর। পায়ে কেম্বিসের জুতো। চেহারায় কোনও বদল নেই। একদম সেই উপেন! সে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে গগনেন্দ্রকে বুকে টেনে নিয়ে খুব সহজ আর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কষ্ট হয়নি তো গগন? শোভা কেমন আছে? তুমি তো এখন আমার পরমাত্মীয়!'

গগনেন্দ্র এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ভালো। এই ব্যাগে কিছু আর্মস আছে। তারিনীদা পাঠিয়েছেন। তিনি এলেন না। বললেন, নৌকোয় থাকবেন।'

'চলো বসি।' ব্যাগটা হাতে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বলল উপেন। চারদিকে কালো জঙ্গলের মাঝখানে যেন কয়েক কাঠা জমির গাছ কেউ কেটে নিয়ে চলে গেছে। তার বদলে রেখে গেছে দুটো বড়ো বড়ো পাথর। মাথার ওপর ক্ষয়াটে চাঁদ। গগনেন্দ্রর শরীর কেমন ছম ছম করে উঠল। উপেনকে সে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে না তো?

'আপনিই তো বীরেনবাবু?' একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে শান্ত স্বরে বীরেনকে প্রশ্ন করল উপেন। 'আপনার গোয়েন্দাগিরির খবর তারিনীদা মারফৎ জেনেছি। গগনেন্দ্র কিন্তু ডিটেকটিভ স্টোরির বিরাট ভক্ত।'

'বীরেনবাবু বলার দরকার নেই। শুধু বীরেন বললেই চলবে।'

'এই দু-জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' সঙ্গীদের দেখিয়ে বলল উপেন। 'গোবিন্দ আর তরণীমোহন। ওরা একজন কালেক্টরকে গুলি করে ফেরার হয়েছে। তবে কালেক্টর মরেনি।'

গগনেন্দ্র ভালো করে দেখল ছেলে দুটিকে। বয়স খুব কুড়ি একুশ। দেখলে মনেই হয় না কালেক্টরকে গুলি করার মত সাঙ্ঘাতিক কাজ এরা করতে পারে।

'যদি কিছু না মনে করেন—'। বীরেন কোলের ওপর রাইফেলটা শুইয়ে রেখে বলল। —'আপনাদের প্ল্যান আমি শুনলাম। এ ভাবে না নামলেই কি নয়? গান্ধীর পলিসি কি খুব ভুল?'

'ব্যাপারটা তা নয় বীরেন।' উপেন সোজা হয়ে বসল। 'তিনি বিরাট কাজ করছেন। কিন্তু তিনি সবটা নন। এখানে আমাদের একটা ভূমিকা থাকতেই হবে। আইন অমান্যের বেলায় তো দেখলাম সরকার কী ভাবে বলপ্রয়োগ করল। কংগ্রেসের অলমোস্ট সব টপ লিডারদের জেলে ভরে দিল। বাট দে উইল লিসন টু দ্য সাউন্ড অফ ফায়ার। ডুয়ার্সে সেটা সহজেই করা সম্ভব। আমার হাতে কম করে পঞ্চাশ জন রাজবংশী তরুণ আছে। এদিকে রসদ যোগার করাটা কঠিন। কিন্তু করতে পারলে বাকি কাজটা সোজা!'

'কী করতে চাও?' গগনেন্দ্র অসহায়ের মত জিগ্যেস করল। 'বক্সা জেল ভাঙবে তোমরা? এ কি সম্ভব?'

'হয় তো না গগন।' আবার পাথরে হেলান দিল উপেন। 'এখনও পর্যন্ত একটাও সশস্ত্র বিপ্লব সফল হয়নি আমাদের। কিন্তু আমরা কি সফল হওয়ার জন্য লড়ছি? আমাদের কাজ কেবল ধাক্কা দেওয়া। ডুয়ার্সে একটা সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তুলতে পারলে খুব জোর একটা ধাক্কা দেওয়া যাবে। ভেবো না আমরা মূর্খের মত কাল থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। তার আগে সংগঠন বাড়াতে হবে। জৈন্তী থেকে মাদারিহাট পর্যন্ত আমি চষে বেরিয়েছি। মঘা দেওয়ানের লোকেরা আমাকে ডুয়ার্স চিনিয়েছে। এবার এদিকটা বুঝে নিতে হবে। আমার নামে পুলিসে কোন কেস নেই। আমি হয় তো একবার গোপনে জলপাইগুড়িও যেতে পারি। কিন্তু তোমাদের জানাব না।'

'কেন?'

গগনেন্দ্রর প্রশ্ন শুনে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উপেন হালকা স্বরে বলল, 'তোমরা আমাকে জলপাইগুড়িতে আটকে দিতে পারো।'

'দেবো না। বরং জানতে পারলে তোমার জন্য রসদ যোগার রাখার চেষ্টা করব।'

'থ্যাঙ্কিউ গগন!'

'তোমার প্ল্যান বলো। আমরা কিন্তু রাত ফুরোবার আগেই বিদায় নেব।'

'কাল সকালে যাব চালসা। শুনেছি হিদারু নাকি ওদিকেই কোথাও লুকিয়ে আছে?'

'বাবামশায় বলেছেন ওর জামিন হয়ে যাবে। একটু সময় লাগতে পারে।'

'ওর সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগত। হিদারু না থাকলে তারিনীদাকে পেতাম না। সিগারেট আছে ভাই?'

'নিশ্চই।' বীরেন পকেট থেকে টিন বের করে এগিয়ে দিল। সকলেই ধরাল একটা করে ক্যাপস্টান। তারপর মেতে উঠল গল্পে। অবশ্য বক্তা মূলতঃ উপেন। ডুয়ার্সের কোনায় কোনায় ঘুরে বেড়ানর অদ্ভুত সব কাহিনী বলতে লাগল সে। কী ভাবে কোথায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে তাঁদের সমস্যায় ফেলা যায়— তা বিশদভাবে বোঝাল। অজস্র ছোট ছোট রেলপুলের একটা উড়িয়ে দিলেই কতটা ধাক্কা দেওয়া যাবে তা ব্যাখ্যা করল। মুগ্ধ হয়ে তাঁর পরিকল্পনা শুনতে শুনতে মনে হলো যেন বক্সা জেল ভেঙে বন্দীদের বের করে নিয়ে আসাটা অতি সহজ কাজ। প্রথমে উড়িয়ে দেওয়া হবে দু-তিনটে রেলপুল আর টেলিগ্রাফ পোস্ট। তারপর হামলা হবে বক্সা জেলে। প্রচুর পরিমাণে গোলা বারুদ নিয়ে যদি বক্সা দখল করে বসে থাকা যায় তা হলে তা উদ্ধার করতে ইংরেজদের দম বেরিয়ে যাবে।

'তা হলে তোমাদের চাই মেশিন গান।' বীরেন উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে। 'টপ পজিশনে বসে ফায়ার করবে।'

'মেশিন গান হলে খুব ভালো হয়। তবে প্রচুর বন্দুক লাগবে। রাইফেল চাই। শুনেছি জার্মানরা দারুন একটা রাইফেল বের করেছে!'

'ব্রিটিশদের চাইতে ভালো?'

'রাশিয়ানরাও খুব এগিয়ে গেছে রাইফেলে!'

'আচ্ছা, তোমরা বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে পড়েছ?'

সময় কেটে গেল কোথা দিয়ে কেউ টের পেল না। হঠাৎ একটা পাখির ডাকে চমকে উঠে উপেন বলল, 'ভোর হতে দেরি নেই গগন! এবার যেতে হয়!'

সবাই চুপ করে গেল। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা গ্রাস করে ফেলল চারদিক। এবার যেতে হবে। মন খারাপ করলে চলবে না। উপেনের হয়ে কাজ করতে হবে তাঁদেরকেও। অস্ত্র যোগার করে গোপনে পাঠিয়ে দিতে হবে তারিনী বসুনিয়ার লোকের হাত দিয়ে। টাকা চাই। উপেন জলপাইগুড়িতে এলে তাঁকে টাকা যোগার করে দিতে হবে।

'এটা তুমি রাখো।'

শোভার দেওয়া বিপদতারিনীর তাবিজটা চেন সুদ্ধু উপেনের হাতে দিয়ে বলল গগনেন্দ্র। উপেন সেটা উল্টে পাল্টে দেখে হাসিমুখে গলায় পরে নিয়ে বলল, 'বোনের শুভেচ্ছা সঙ্গে থাকলে দাদারা জোর পায় বই কি! তুমি তো বাবা হতে চলেছ। সন্তানের নাম কিছু ভাবলে?'

'ছেলে হলে নাম দেব উপেন্দ্রকিশোর।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠে পাখিদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

শালবনে রক্তের দাগ

আমি পনের টাকায় বেচে দিয়েছিলাম সাপটা। আমি দেখেছিলাম মেসো শরীর দিয়ে ঢেকে রেখেছে কৃষ্ণা পিসীকে। সেই সাপটাই কি পাইথন হয়ে এল বিছানায়, রুক্মিণীর জায়গায়? কিন্তু সে সাপ তো পাচার করে দিয়েছে শ্যামল। এরপরেও শিলিগুড়িতে বন্যপ্রাণ বিষয়ক আলোচনায় সভায় বক্তব্য রাখলাম আমি। কলকাতায় ফিরে এসে খুঁজতে গেলাম রাঘবকে। দশতলা সমান উঁচু ময়লা পোড়াচ্ছে রাঘব। সেখানে একটা ডেড বডি ঢুকে জ্বলে যেতেই পারে। কিন্তু আমার ঘরের দরজায় কান পেতেছিল কে? কেন? তারপর? **সাগরিকা রায়**-এর থ্রিলার।

১৩

রিসর্ট বানাতে চেয়েছে সত্যম। রুক্মিণী নাকি এই ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছে। আমার কলকাতা যাওয়ার পরে সত্যমের সঙ্গে ফোনালাপে বাপ-মেয়ে রিসর্ট নিয়ে আলোচনা করেছে। লাটাগুড়ি ওদের ফার্স্ট অপশন। সেকেন্ড হচ্ছে বক্সা। এভাবে অনেকগুলো নাম লিস্টে রেখেছে রুক্মিণী। সত্যমের ঝট করে আলিপুরদুয়ার চলে আসার কারণ বুঝতে একটু হলেও দেরি হল। সত্যম বিনা উদ্দেশ্যে এখানে আসবে এটা ভাবাই বোকামি আমার। ব্যবসা ছাড়া লোকটা বোঝেনা কিছু। আর মেয়েও হয়েছে বাপের মতো। কলকাতা থেকে এত মেসেজ, এত কথা, অভিমান, অনুরাগ, হোয়াটস্ অ্যাপ... তারপরেও পুরো ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিল আমার কাছে! আশ্চর্য হয়নি। এটা নিশ্চয়ই সত্যমের নির্দেশ! নির্দেশ থাকলেও রুক্মিণীর কি স্বার্থ নেই এতে? ভেবেছে বাপ যতটা পারে করে দিক, তারপরে দরকারে ভাঙা কুলোটা তো আছে! প্রেমের কলাশিল্প দেখিয়ে বাকিটা আদায় করে নেবে। রাঘব আসবে। সত্যমের থেকে রাঘবকে লুকিয়ে রাখতে হবে। নয়তো রাঘবকে কাজ করতে দেবে না সত্যম। এমনকি শ্যামলের থেকেও লুকিয়ে রাখতে হবে রাঘবকে। খুব ঝুঁকির কাজ। আজকের কাগজে দেখেছি গাছ পাচারের অভিযোগে অ্যারেস্ট হয়েছে কোনও এক ফরেস্টের গার্ড। কিছুদিন ধরেই নাকি তাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল। যখন তখন বনের গহীনে ঢুকে যাওয়া, যেদিক দিয়ে কাঠ চোরেরা ঢুকবে, সেদিক থেকে কায়দা করে পাহারা সরিয়ে নেওয়া... এসব দেখে সন্দেহ হয় বাকি গার্ডদের। ওরা ফরেস্টের ডেপুটি রেঞ্জারকে জানিয়েছিল ব্যাপারটা। জঙ্গল! এখন টাকা রোজগারের সবচেয়ে সহজ পথ। চোরা শিকার, আর পোচিং! পোচার রাতের অন্ধকারে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঢুকছে। হাতি, বাঘ, গন্ডার মেরে ছাল, দাঁত খড়্গ কেটে নিয়ে পালিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে অনেক বনরক্ষী মরে। এই রকমই চলে আসছে। কত বছর ধরে? কবে শুরু হয়েছিল বনকে ব্যবহার করা? সেদিন আদিবাসী মেয়েটি সাপের বাচ্চা বিক্রি করছিল, আমি আট টাকা তাকে দিয়ে বাচ্চাটাকে কিনলাম, সেদিন থেকে? এই ব্যবসা বেড়ে গেল যেদিন

আমিই সাপের বাচ্চাটাকে প্রায় ডবল দামে সাপুড়ের কাছে বিক্রি করেছিলাম? শুরুয়াত কি সেখানেই? নাকি আরও আরও আগে, অনেক অনেক হাজার বছর আগে থেকেই বনকে ইউজ করে চলেছে মানুষ? কিচ্ছু করার নেই। লোভ টেনে আনে আরেক লোভকে। ক্রমে পাতাল প্রবেশ ঘটতে থাকে।

ইচ্ছে ছিল আলাদা করে রুক্মিণীর সঙ্গে একটু আলোচনা করি। সত্যম সম্ভবত সেটা বুঝে মেয়েকে আগলে আগলে রাখছিল। রুক্মিণী ভোরে ওঠে না। আমার আবার চিরকালই ভোরে ওঠা মাস্ট। আজও অভ্যেস বজায় রেখে ভোরে উঠেছি। রোদ উঠবে কি না জানি না। আকাশে হালকা মেঘ ছড়িয়ে আছে। এই সময় কেমন একটা মন কেমন করা ভাব হয়। আমাদের আলিপুরদুয়ারের বাড়ির ছোটবেলার গন্ধ ভেসে আসে কিছু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। জেঠামণি, দাদু, দিদা... কোথায় চলে গিয়েছে সব। ভালবাসার মানুষের গায়ে একরকম গন্ধ থাকে। সেই গন্ধ আর পাই না। ডুয়ার্স আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে। জঙ্গল কেটে রিসর্ট হচ্ছে! রিসর্ট! অনেক পয়সা এই ব্যবসায়। সত্যম ব্যবসায়ী। মাথায় সবসময় গিজগিজ করছে ব্যবসা। কবে যে এই রিসর্টের ভাবনা মাথায় ঢুকিয়েছে, বুঝিনি। চিরকেলে হাঁদা অধ্যাপক কী আর বুঝবে! আফশোষে চুক চুক শব্দ বেরিয়ে আসে ঠোঁট ফুঁড়ে।

পেছনে পায়ের শব্দ। কেউ আসছে! হালকা পারফিউম আগেই এসে তার খবর জানিয়ে গিয়েছে! কিন্তু এত সকালে রুক্মিণী উঠেছে? কোথাও বের হবে নিশ্চয়ই। ওর বাপটা কখন মেয়ের সঙ্গে শলা করে রেখেছে কে জানে!

—হাই! আমি এসেছি, টের পাওনি!

হেসে ঘাড় ঘোরালাম —হাই। বাপরে, কোথাও বের হচ্চ নাকি?

ডার্ক কালারের জাম্প স্যুট, হাই হিল, আই শ্যাডোর রং পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে। প্যাস্টেল কালার লিপ। উইং আইলাইনারে উড়ে যাওয়া পাখির আভা, সাইড পার্টিং ফ্রেঞ্চ রোল। রুক্মিণী হাইফাই হয়ে আছে এই ভোরে। ওকে নিয়ে কোথাও বের হচ্ছে সত্যম। এত ভোরে কোথায় যাচ্ছে? দূরে কোথাও কি?

—বের হচ্ছি। ঘুরে আসি। বাবা চলে যাওয়ার আগে বলছে আমাকে নিয়ে ঘুরে আসবে।

—বাহ, কিন্তু রিসর্টের কথাটা ভুলে গিয়ে অযথা ঘুরতে যাচ্ছ?

—ওহ, তুমি ভারি... হিংসুটে। সত্যমজির সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছি বলে হিংসে? হা হা হা!

—হাই, তোমরা এই সকালে আড্ডা দিচ্ছ? গুড গুড। সত্যমের পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। খুব ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও মুখে লাইট ফাউন্ডেশন ইউজ করে সত্যম। কালো ড্রেসে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওকে। কোথায় যাচ্ছে এরা দু'জন?

বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা। বিকেলে ফিরে আসবে। শ্যামলকে ফেউ লাগিয়ে দিলাম। কোথায় যাচ্ছে সত্যম দাশগুপ্ত মেয়েকে নিয়ে?

বারান্দা থেকে দেখেছি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল বাপ-বেটি। পরম আদরে রুক্মিণীর কোমর জড়িয়ে ধরেছে সত্যম। শ্যামল পেছনের চিকরাশি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দেখলাম। হেলমেট পরে নিয়েছে আগেই। বাইক বেরিয়ে গেল সত্যমের গাড়ির পেছনে পেছন শ্যামল যে খবরই দিক না কেন, আমার মনের কোণে একটা গুবরে পোকা কখন যে ঢুকে পড়েছে! কির কির কির কির করে চলেছে সারাক্ষণ। রুক্মিণী আজ অনবধানে বলে ফেলেছে একটা কথা। নিজের বাবাকে অদ্ভুত সুরে বলেছে 'সত্যমজি'! আমি কখনই এভাবে বাবাকে সম্বোধন করতে শুনিনি রুক্মিণীকে। রুক্মিণী কি সত্যমের নিজের মেয়ে? অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা ছবি মাথায় ঘুরছে। সত্যমজি রুক্মিণীর কোমর জড়িয়ে নেমে যাচ্ছে! ওদের দু'জনে একই সঙ্গে কোনও অভিযানে নেমেছে, সেটা আন্দাজ করতে পারি। রিসর্টের জন্য হেদিয়ে মরছে সত্যম। মেয়েকে সামনে রেখে কাজটা এগিয়ে নিতে চাইছে। শো পিস গিফট? রুক্মিণী শেষপর্যন্ত এভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করছে?

শ্যামল ফিরেছে বিকেলের দিকে। কোথায় কোথায় নতুন রিসর্ট হচ্ছে, কোন রিসর্ট বিক্রি হবে, তার মোটামুটি একটা সমীক্ষা করে এসেছে। তারপরে আসল খবরটা দিল —ওরা সিকিমে গেল স্যার।

—আচ্ছা! নেক্সট?

—নেক্সট মানে, স্যার আর ম্যাডামের সঙ্গে আরও দু'জন মহিলা ছিল।

—মহিলা? দু'জন? তুমি কি তাদের চেন?

—চিনি মানে... যেন চেনা চেনা লাগল! ভাল করে দেখতে পাইনি। ঘোমটা টানা ছিল। তবে মহিলাই। পুরুষ মহিলা সেজে আছে এমন নয়।

মহিলা? ঘোমটা টানা মহিলা? সত্যমের গাড়িতে ঘোমটা টানা মহিলা। ওরা কি নারী পাচার করছে? ঘোমটা টানা মানেই জড়সড়, অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলা নাও হতে পারে। সেটা ভান হতে পারে! বা ছদ্মবেশ! শ্যামল ওরা নারী পাচার করছে!

—আমারও সেটাই মনে হয়েছে স্যার। শ্যামল নীচু স্বরে কথা বলতে গেলে ভ্রু ওপর নিচে ওঠানামা করে।

নারী পাচার? সত্যমের পুরনো পেশা। তাহলে রুক্মিণীকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ? ভাবনার থই পাচ্ছি না। সিকিমে কেন গেল সত্যম! আমাকে কী লুকোচ্ছে ওরা?

শ্যামলের মোবাইল বেজে উঠেছে। শ্যামল ফোন বের করে স্ক্রিনের দিকে দেখতে দেখতে সিঁড়ির ধাপ ভেঙে নেমে গেল। শ্যামলের হাতে ব্ল্যাকবেরি ফোন। হাতে পয়সা এসেছে শ্যামলের। ওকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া আছে। কতদিনে সে কাজ করে উঠতে পারবে জানি না। যেদিনই পারুক, কাজটা করে ফেলা চাই। শ্যামলকে সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। এতে ওর লাভ বই ক্ষতি নেই! একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে, সে অর্থে শ্যামল আমার কাজ ইদানিং একটিও করে উঠতে পারেনি। কেবল আশ্বাস দিয়ে চলেছে। ও কি ডাবল এজেন্টের কাজ করছে? একটা ফোন এল, ও আমার সামনে রিসিভ করল না! সেটা না-ই করতে পারে। কিন্তু মনটা কিন্তু কিন্তু করছে কেন? আমার ঘরে সাপ রাখার সুবিধে সবচেয়ে বেশি শ্যামলের। যখন কিছু ক্লু পাচ্ছি না, তখন সবচেয়ে অসম্ভবটাকেই সম্ভব বলে ভাবতে হবে। শ্যামল কি সত্যমের হয়ে কাজ করছে? সত্যমের ঘর থেকে সাপটা আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে, এমনও হতে পারে! সত্যম পাচার করেছে সাপটাকে। শ্যামলের মারফত। আমি ইডিয়ট, কিছু বুঝতে পারিনি!

ঘরে ঢুকে দেখি এসি অফ না করেই চলে গিয়েছে রুক্মিণী। রাত পোশাক বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে। ঘরটা বড্ড অগোছালো। নিখিল কোথায়? ওর সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। সাড়া এবং শব্দ— দুটোই কী মজাদার শব্দ নিখিলের জন্য। হা হা হা! এমনিতেই যথেষ্ট চুপচাপ ছেলে। কথাবার্তা নেই। নিজের মনে থাকে। ওর কাছে মোবাইল ফোন নেই।

নিখিল দেখা দিতেই কথাটা বললাম। ও ছোট্ট টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে হাসল —দরকার হয় না স্যার!

—তা বললে হয়? একটা ভাল দেখে মোবাইল ফোন দরকার তোমার। কত কাজে লাগে, সেটা জানো? তারপরে একটা বাড়ি। শক্তপোক্ত বাড়ি। বাড়িতে উঠোন থাকবে। সবজি বাগান থাকবে। একটু জমি চাই। ব্যাঙ্কে টাকা, ঘরে বউ! ছেলে মেয়েকে এই ডুয়ার্স দেখাবে না? তুমি যা যা দেখ, সেসব ওরাও দেখবে না?

নিখিল এতগুলো স্বপ্ন একবারে দেখতে জানে না। ওর চোখ ক্রমশ স্বপ্নাতুর হয়ে আসছিল।

—কিন্তু, আমার কাছে এত টাকা নাই স্যার! কোথায় পাব এইসব!

—তুমি চাও? তাহলে আমার ক'টা কাজ করে দাও। আমি একজনকে খুঁজছি। একটা মেয়ে। মেয়েটার ছবি আছে আমার কাছে। তুমি নিয়ে রেখ। মেয়েটাকে জঙ্গলের দিকে ঘুরতে দেখা যায়। সে আমার খুব দরকারি জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।

—নারী? এদিকে নতুন কোনও নারীকে দেখি নাই তো! দেখলে বলব।

—আর কাঠচোরদের কথা কাউকে বলার দরকার নেই। বুঝলে? ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

—বনের দেবতা আছেন। সে রাগ করে স্যার। দুঃখ করে। কান্দে। এই কথা লুকাবো কী করে? পাপ হবে।

—বলবে ভুল দেখেছ। যারা কাঠ চুরি করছিল, তাদের মুখ আমি দেখতে পাইনি।

—কিন্তু তাদের মুখ যে আমি দেখেছি স্যার। জ্বল জ্বল করে মুখগুলান।

—তাহলে তোমার বাড়ি, বউ, ছেলে মেয়ে, ব্যাঙ্কের টাকা... সব হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

—যাক। আমি ওসব চাইনা স্যার। লোভ খুব খারাপ। পাপ স্যার। বলতে বলতে চোখ তুলে তাকায় নিখিল। সরু সরু চোখে জল চিক চিক করছিল। ভেজা তোয়ালেটা অকারণেই ঝেড়ে নিল একবার। যাই করুক না, আজ ঘুমোতে পারবে না নিখিল। একটা স্বপ্ন দুলতে থাকবে চোখের সামনে। ঘুম কী আর সহজে আসে! হা হা হা! ছক কেটে দিলাম। এবারে ভাবনা ওর।

১৪

সত্যম ফিরেছে বেশ রাতে। সারাদিন গুমোট ছিল। এখন বৃষ্টি হচ্ছে অন্য কোথায়। তারই ঠান্ডা বাতাস বয়ে এল সত্যমের গা ঘেঁষে। সত্যমকে ক্লান্ত নয়, বরং বেশ ফুরফুরেই দেখাচ্ছে। আমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এল —ডিনার হয়েছে?

—ওয়েট করছি তোমরা আসবে বলেছিলে। দেরি দেখে ভাবছিলাম আজ আর এলে না হয়ত। রুক্মিণী কোথায়? আসেনি?

—আরে, আসছে, আসছে! সত্যম অশ্লীল ইঙ্গিত করে হেসে উঠল। বলতে বলতে রুক্মিণী উঠে এল। ওর হাইহিল জানান দিচ্ছে রুক্মিণী এসে গিয়েছে। লাল টকটকে হালকা শাড়ি। এক চিলতে কাঁচুলি ব্লাউজ হুক ফাটো ফাটো অবস্থায়, ডার্ক কালার লিপ, ন্যুড আইশ্যাডো, চোখে মদির দৃষ্টি। উঁচু করে পনিটেল বাঁধা।

—কুইন! শাড়িতে দারুণ দেখাচ্ছে।

—কমফর্ট নয়! আমি ক্যারি করতে পারি না। বাট, থ্যাঙ্কস!

বলে এমন আদুরে ভঙ্গীতে হেসে উঠল! আমার ভিত নড়ে উঠল।

—বল, কেমন কাটালে সারাদিন? প্রচুর ওয়াইন গিলেছ?

—নো, নট ওয়াইন। আজ টাকিলা।

—টাকিলা! মেক্সিকোর এই মদ আমার ভাল লাগে।

—তো চল, পার্টি হয়ে যাক।

—আজ আমরা সিকিম ঘুরে এলাম। সত্যম গেলাসে হুইস্কি ঢালছে —সঙ্গে ছিল দুটো ক্যানারি পাখি। রুক ওদের নাম দিয়েছে সোনামন। তামাং ওর কাস্টমারের খিদে মেটাতে টাটকা পাখি খুঁজছিল। তাই ওরা থেকে গেল। ভাল মালকড়ি পাবে। আর কী চাই?

—কোথায় পেলে এই টাটকা পাখি?

—ওহ্, তোমাকে টেস্ট করাইনি বলে

আমার কাছে কিছু লুকিয়ে যাচ্ছে বাপ-মেয়ে দুজনেই। কিন্তু সেটা কী হতে পারে? অস্পষ্ট জিনিস ভালবাসি না। যা হচ্ছে, আমাকে তার পুরোটা জানতে হবে। এরা সকালে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিকিম যাচ্ছে একবারও বলেনি! ফিরে এসে জিজ্ঞাসা না করতেই বলে দিল? কেন?

রাগ? আচ্ছা, নেক্সট পাখি পেলেই ফার্স্ট বাঘের গুহায় ছেড়ে দেব। প্রমিস। গেলাস হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে সত্যম।

—কিন্তু পেলে কোথায়? কোন জঙ্গল টুঁড়ে নিয়ে এসেছ?

—নো, ভেরি সিক্রেট। সেটা তো বলা যাবে না! আম খাবে তো খাও। তার জন্মবৃত্তান্ত জানার দরকার নেই। সত্যম বসে পড়ল। রুক্মিণী স্বপ্নালু চোখে তাকাল, ফের চলে গেল ঘরে ওর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে চেঞ্জ করবে।

—চিন্তায় পড়ে গেল! এস প্রফেসার সাব, একটু পার্টি হয়ে যাক।

—পার্টি? কোন খুশিতে?

—খুশি বানিয়ে নাও একটা। তোমার যে কোনও সাকসেসের কথা ভাব। ভাব এ সাম মস্তানি মদহোশ...

বকবক করে চলেছে সত্যম। আমার কাছে কিছু লুকিয়ে যাচ্ছে বাপ-মেয়ে দুজনেই। কিন্তু সেটা কী হতে পারে? অস্পষ্ট জিনিস ভালবাসি না। যা হচ্ছে, আমাকে তার পুরোটা জানতে হবে। এরা সকালে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিকিম যাচ্ছে একবারও বলেনি! ফিরে এসে জিজ্ঞাসা না করতেই বলে দিল? কেন? কী ভেবেছিল আমি বাগড়া দেব? পাখিগুলো নিজের কাছে রেখে দেব? এমন হতে পারে কি যে ওরা জেনে ফেলেছে ওদের সিকিম যাওয়ার ব্যাপারটা আমার জানা! সে কারণে এটা আর লুকলো না ইচ্ছে করেই? কেমন করে, কার মারফৎ একথা জেনে ফেলল সত্যম? আমাকে খবরটা দিয়েছিল শ্যামল। তাহলে শ্যামল কি ওদের সঙ্গে আছে? নাকি শ্যামল ফলো করছিল সেটা ওরা দেখে ফেলেছে?

সে যাই হোক, মেয়ে দুটোকে কোথায় পেল সত্যম? আচ্ছা, আমি যে মেয়েকে খুঁজছি, দুটো মহিলার একজন সে নয়তো? সত্যম ওকে আমার সামনে থেকে দূরে পাচার করে দিল নাতো! সবই সম্ভব এই দুনিয়ায়। কে যে আসলে কী, বোঝা মুশকিল।

রুক্মিণী এল ঢিলেঢালা পোশাকে। ক্লিভেজে ঘুমিয়ে আছে মুক্তোর লকেট। হুইস্কি খেতে খেতে রুক্মিণীর দিকে তাকাল সত্যম —তোমাকে কোথায় পাচার করি বলতো? অ্যাই সুভদ্র, নেবে নাকি?

—ওহ ড্যাড, ইউ আর ভেরি নোটোরিয়াস পার্সন। হা হা করে পুরুষালি হাসি হেসে ওঠে রুক্মিণী।

এখন রাত বাড়ছে। বাড়ির লনে টিমটিমে ছোট ছোট আলো জ্বলছে। জোনাকির মতো। শ্যামল হেঁটে বেড়াচ্ছে। মেয়েটার স্কেচের জেরক্স কপি আছে ওর কাছে। হোয়াটস্ অ্যাপে ছবি আছে। তাহলে ঘোমটা টানা মহিলার মুখ যেটুকু দেখেছে, ওর চেনা চেনা ঠেকছিল, অথচ চিনতে পারছিল না। কেন? আর একটা পয়েন্ট মাথা চাড়া দিচ্ছে আমার। গতকালই শ্যামল সিকিমে গিয়েছিল। আজ সত্যম গেল। কোনও যোগ সাজস আছে কি এর মধ্যে?

আজ রাঘবের আসার কথা। আসবেই ও। যে ব্যবসার যে কথা। পদাতিকে আসবে। ওর থাকার ব্যবস্থা করেছি রাঙ্গালিবাজনার মঘু বর্মনের বাড়িতে। ফের দু'দিন পরে ধূপঝোরায় পাঠিয়ে দেব। মূর্তি নদীর কাছাকাছি। খুনিয়া জঙ্গলে যেতে হবে। কাজ আছে সেখানে।

ঘুম আসছে ধীরে ধীরে। সত্যম বারান্দায় এলিয়ে পড়েছে সোফার ওপরে। রুক্মিণী ছোট করে হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। ওর শরীর থেকে বুনো গন্ধ বেরিয়ে আসছে। আজ কেন যে ওকে দেখে জেগে উঠলাম না জানি না। বেডরুমে ঢুকে অপেক্ষা করছি। রুক্মিণী এলে দরজা বন্ধ করে দেব। কিন্তু রুক্মিণী আসছে না! ও উঠে দাঁড়িয়েছিল ঘরে আসবে বলে! তাহলে? আমার মন খুবই সন্দেহপ্রবণ। আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশ থেকে নিজেকে ঝট করে সরিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে রুক্মিণীকে। কিছু বলছে সত্যমকে। কী বলছে?

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে হালকা ফিসফিসে গাছের পাতা দুলে ওঠার মতো শব্দে রুক্মিণী বলছে —মাল গাড়িতেই আছে?

সত্যম আঙুল তুলে আকাশ দেখাল —ওইখানে রেখেছি। যাও, না হলে প্রফেসর সন্দেহ করবে।

রুক্মিণী হাত দিয়ে সত্যমের চুলগুলো ঘেঁটে দিল। সত্যম ওকে টেনে কোলে বসিয়ে ফের ছেড়ে দিল —গো, গো।

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। রুক্মিণী আসছে। ওর পোশাকের খস খস শুনতে পাচ্ছি।

আমার গায়ে হাত দিয়ে আদুরে গলায় ডাকল রুক্মিণী —ঘুমোলে?

আমি জেগে উঠলাম —আমার খুব ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়ার আগে একটু দেশি ওয়াইন হয়ে যাক।

—ওয়াও! দেশি মাল   ? কে দিল? নিখিল? অ্যাই, প্লিজ, দাও! আমি কখনও খাইনি ওটা!

—শ্যামল জোগাড় করেছে। ওকে বলেছিলাম। ভাত পচিয়ে হয়। হাঁড়িয়া বলে। আবার আদর করে পচাই বলতে পারো।

—ওহ, সো সুইট। আমি শুনেছি এটার কথা। দাও প্লিজ।

গেলাস সাজিয়ে নিলাম। রুক্মিণী প্রথম চুমুক দিয়ে একটু নাক সিঁটকেছে। অল্প অল্প খেতে খেতে নেশায় ঝিমিয়ে পড়ছিল। সময় চাই! তিনটে গেলাসে নেশা হবে না। আরেকটু দিলাম ঢেলে। বেসামাল নারীকে দেখতে ভারি ভালবাসি। অনাবৃত ডান পা সোফায় তুলে দিয়েছে রুক্মিণী। হাত থেকে গেলাসটা পড়ে যেত। গেলাস নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলাম। চুপচাপ আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে মাল আছে। উঁকি দিয়ে দেখি শ্যামল সত্যমের হয়ে ডিউটি দিচ্ছে! রুক্মিণীর শপিং মল পায়চারি করে যাচ্ছে। ও মাল পাহারা দিচ্ছে। সত্যমের মাল পাহারা দিচ্ছে আমার লোক। এই লোককে ফেউ লাগিয়েছি সত্যমকে পাহারা দিতে! কিন্তু গাড়িতে আছেটা কী? মহিলা দুটোকে গাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে কি? বা, কিচ্ছু অসম্ভব নয়, মহিলারা বেঁচে আছে কি না! সিটের নিচে, বা ডিকিতে ভরে রাখা হয়েছে বডি! সত্যম আর রুক্মিণীকে স্বচ্ছ চোখে আর দেখতে পারছি না। এখন প্রবলেম একটাই। শ্যামলকে সরাতে হবে এখান থেকে। কীভাবে ... কীভাবে... হুম! রুক্মিণীর কাছে ফিরে গেলাম। ঠিক একই ভাবে ল্যাদ খেয়ে পড়ে আছে রুক্মিণী। গভীর ঘুম ঘুমোবে তিনটে ঘুমের ট্যাবলেট মেশানো পচাই খেয়ে! ওর ফোন... ফোন... এই যে। ফোন তুলে চটপট শ্যামলের নাম খুঁজতে শুরু করেছি। নাম নেই তো! অন্য কোড রয়েছে শ্যামলের নামের জায়গায়! শালা খানকির অওলাদ! এস লেটার দিয়ে শ্যামলকে পেলাম না। শ্যামলের বিকল্প নাম কী হতে পারে! আচ্ছা, একদিন শ্যামলকে কী কারণে ডাকতে হয়েছে। রুক্মিণী বলেছিল তোমার রাধেকে ডাকো। রাধে! রুক্মিণী শ্যামল শব্দ থেকে বর্ণ বাদ দিয়ে শ্যাম শব্দ নিয়েছে। পুরো মজা করেছিল মনে হয়েছিল তখন। সার্চ করে দেখি ...রাধে ...রাধে ...নাঃ! তাহলে? কী হতে পারে শ্যামল শব্দটা! এস দিয়ে শব্দতে কত নাম রয়েছে ...সুহানা, শাহিদ, সোরাব... শপিং মল ...সজনা... ! বুঝতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। শপিং মল শব্দে মল রয়েছে। হুম, এটা ট্রাই করি? একটা মেসেজ পাঠালাম —দরকার নেই। তুমি ঘুমোতে যাও। বেশি ঘোরাঘুরি করতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে। সেন্ড করে দিয়ে ব্যালকনি থেকে নজর রাখছি। শ্যামল ফোনটা চোখের সামনে তুলে পড়ছে কিছু? নাকি গেম খেলছে? মেসেজ কি ওর কাছেই গেল?

> ফলওলা কাছাকাছি এসে কানুকে কী একটা জিজ্ঞাসা করাতে কানু হাসল। তারপরে পাঞ্জাবি তুলে পেটের কাছে গুঁজে রাখা প্যাকেটটা বের করে লোকটার হাতে দিতেই অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেল। ফলওলা চট করে পিস্তল বের করে কানুকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিল।

শ্যামল একবার গ্যারেজের দিকে তাকাল। তারপর আমার বাড়ির পেছন দিকে ওর নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলে গেল। ওয়াও! তাহলে রুক্মিণী ম্যাডাম, তোমার শপিং মল হল শ্যামল! ঘড়ি ধরে পনের মিনিট অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে নেমে গেলাম নিচে। সত্যম নিজের বেডরুমে ঢুকেছে। সহজে এদিকে আসবে না। বিশেষ করে পাহারা আছে জানে বলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

চারপাশ অসম্ভব নিঝুম। নিস্তব্দ্ধতার একটা শব্দ আছে। কেমন ঝিমঝিমে শব্দ! শব্দটা শোনা যায় না এমনিতে। কিন্তু মন সমস্ত অনুভূতিকে এক জায়গায় একীভূত করে শব্দটা শুনতে পায়। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে নামছি। আমার বাড়ি, অথচ আমি যেন চোর! আচ্ছা, তাহলে গাড়িটা রয়েছে গ্যারেজে। শ্যামল চলে যাওয়ার আগে একবার গ্যারেজের দিকে তাকিয়েছিল। গ্যারেজের চাবি কি শ্যামলের কাছে? নাকি সত্যমের কাছে? সত্যম কাউকে বিশ্বাস করে না। ওর যা ব্যবসা, তাতে এটাই স্বাভাবিক। চাবি ওর কাছেই আছে। অসুবিধে নেই। আমার গ্যারেজটা চারটে গাড়ি রাখতে পারে। ওখানে আমার দুটো গাড়ি আছে। অগত্যা আমার কাছে চাবি আছে। আমার কাছেও গ্যারেজের চাবি আছে এটা জানে বলেই হয়তো শ্যামলকে পাহারায় রেখেছিল সত্যম। যদি আমার গাড়ি দরকার হয়, শ্যামল নিজে গাড়ি বের করবে, যেটা বরাবর করে আসছে। তাহলে শ্যামল আগেও কি এই গ্যারেজকে নিজের কাজে আরামসে ব্যবহার করেছে?

১৫

কোথায় কী হচ্ছে জানি না। চারপাশে একটা জাল ঘিরে রেখেছে আমাকে। সেই যেদিন ফিনাইল বেচতে এসেছিল সুন্দরী মেয়েটা, সেদিন, সেই ক্ষণ থেকে শুরু হয়েছে এক অস্বাভাবিকতা!

চাবি বের করে গ্যারেজ খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আলো জ্বেলে বিপদ বাড়ানোর দরকার নেই। মোবাইল ফোনের টর্চ জ্বেলে সত্যমের গাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না! ডিকি সীল করা। চাবি শ্যামল বা সত্যমের কাছে। তিনটে গাড়ি চেক করে নিলাম। বলা যায় না আমার গাড়ি হয়তো ইউজ করেছে। কী রেখেছে সত্যম? কিছু বুঝতে পারছি না। জানি না আমাকে লুকিয়ে কী হচ্ছে!

গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমি গ্যারেজ থেকে সাবধানে বেরিয়ে এলাম। শ্যামলকে ঘরে ডেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারি। কিন্তু শ্যামল কেনা হয়ে গেছে সত্যমের। আমি যা জানতে চাইব, শ্যামল সে কথা জানিয়ে দেবে সত্যমকে। সুতরাং আপাতত নীরবে সব লক্ষ্য করে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমার পাঠানো মেসেজটা শ্যামলের ফোনে রয়ে গেছে! সেটা রুক্মিণীকে দেখালে...! কথাটা ভেবে না দেখেই কাজটা করে ফেলেছি। দ্রুত আমার বেডরুমে ঢুকে পড়লাম। একইভাবে পড়ে আছে রুক্মিণী। স্খলিত বেশ। ফোন টেবিলের ওপর নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। ফোন তুলে নিলাম। ঘরের কোণের সোফায় বসে মেসেজ পাঠালাম শপিং মলের নাম্বারে। 'আমার মেসেজটা ডিলিট করে দাও এখনই'। শ্যামল রুক্মিণীর আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারবে না কিছুতেই। ব্যস! নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যাই ডিয়ার শপিং মল... ডার্লিং রুকু!

আমি অধ্যাপনা করি বলে ভেব না বই ছাড়া কিছু জানি না! আমাকে জীবন দেখিয়েছিল কানু মিস্ত্রি নামের এক কাঠ মিস্ত্রি। আমার বয়স তখন পনের। সেদিন

বৃষ্টি পড়ছিল সারাদিন ধরে। আমাদের ডুয়ার্সের বাড়ির উঠোন ভেসে যাচ্ছিল বৃষ্টি ধারায়। বাড়ির সামনে বুনো বাদাম গাছের লাল মোটা মোটা খোলস ভেঙে বাদাম পড়ে আছে গাছের গোড়ায়। গাছের বিশাল গা বেয়ে বৃষ্টি নেমে আসছিল মাটি লক্ষ্য করে। আমাদের বাড়ির একতলার ঘেরা বারান্দায় কানু মিস্ত্রি কাঠের কাজ করছিল। করাত দিয়ে কাঠ কেটে সাইজ করছিল কানু। বাবা একখানা শো কেস বানাতে দিয়েছিল কানুকে। বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া ছোট ঘরে বৃষ্টিতে ভিজে আসা ছাতাটা, জুতোটা, সাইকেল ইত্যাদি রাখা হয়। কানুর সাইকেল ওঘরে আছে। এই ঝম ঝম বৃষ্টির দিনে বাইরে গিয়ে খেলাধুলো করার উপায় নেই। আমি ছোট ঘরে ঢুকেছি যখন, কানু দুপুরের খাবার খেতে বাড়ির ভেতর গিয়েছে। আমি ঢুকে এটা ওটা দেখছি। এই পুরনো ঘরের মধ্যে কেমন একটা দূরের গন্ধ ঘোরাঘুরি করে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে কানু মিস্ত্রির ধূসর কাপড়ের ব্যাগটা দেখে ছেলেমানুষি কৌতূহল হল। কী আছে কানুর ব্যাগে? ব্যাগের চেইন খুলে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেকে হতবাক হয়ে গেলাম। একটা রিভলবার! কানু মিস্ত্রির ব্যাগের ভেতরে একটা রিভলবার! আমার দাদুর কাছে রিভলবার আছে। কোন এক চা-বাগানের সাহেবের থেকে রিভলবার কিনেছিলেন দাদু। আমি রিভলবার চিনি। কিন্তু কানু কী করে...?

সেদিন থেকে কানুকে নজরে রাখা আমার কাজ হয়ে দাঁড়াল। কানু কি ডাকাত? যদি হয়, তাহলে কি বাবাকে জানিয়ে দেব? কে জানে যদিও আমাদের ক্ষতি করে!

মোট চব্বিশ দিনে শো কেস বানিয়েছিল কানু। আর সেই চব্বিশ দিনে আমার শিক্ষা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমি দেখতাম আমাদের বাড়ির পেছনের পায়ে চলা সরু পথের শেষে মোটা লম্বা শালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা সাইকেল চেপে আসা লোকের হাতে প্যাকেট তুলে দিত কানু মিস্ত্রি। ওই প্যাকেটে রিভলবার থাকতো। আর কী কী থাকতো নাম জানি না। তবু বুঝে ফেলেছিলাম সেগুলো বোম, অন্য কোনও অস্ত্র...! কানু অস্ত্রপাচারকারী ছিল। ধীরে ধীরে কানুর আর্থিক অবস্থা উন্নত হতে থাকল। আমি নিপুণভাবে কানুকে যাকে বলে ওয়াচ করে যেতাম। এরপরেও কানু মিস্ত্রির কাজ ছেড়ে দেয়নি। কারণটা বুঝলাম আরও একবছর বয়স বাড়িয়ে। মিস্ত্রির কাজটা ছিল কানুর ছদ্মবেশ। ওটা সামনে রেখে নিপাট মানুষ সেজে থাকতো ও। একদিন মনে হল বাইরের গেটে ঠুং শব্দ পেলাম। তখন ঘোর দুপুর। বাবার শো কেস বানাবার কাজ হপ্তাখানেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি রবিবারের দুপুরে হোমটাস্ক করছি দোতলার পড়ার ঘরে। শব্দ শুনে জানালায় গলা বাড়িয়ে দেখতে পেলাম কে এল। এ সময়ে বাবা, দাদু, কি মা —কেউ বাইরে যাবে না। যায় না। দাদু ঘমোচ্ছে। বাবা পড়াশোনা করে ছুটির দিনে। মা একটু ঘুম দিয়ে নেয় রোজের মতো। তাহলে কারও আসার কথা নয় এখন। দেখি চোরের মতো চুপিচুপি বাড়িতে ঢুকছে কানু। আমিও তড়াক করে নেমে এলাম নিঃশব্দে। বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে দেখি কানু বারান্দার ছোট ঘরে ঢুকে যাচ্ছে! কেন? এখনও কানু ওই ঘরটা ইউজ করে যাচ্ছে! কানুর হাতে কিছু ছিল। একটা বড় প্যাকেট ছিল। এই ঘরে সম্ভবত রাখতে এসেছে। আমাকে এখানে দেখলে কানু গুলি করে মেরে দেবে আমাকে। ও নিশ্চয়ই সাক্ষী রাখবে না। গোয়েন্দা গল্প পড়ার ফলে যুক্তিটা মাথায় এসেছিল বলা বাহুল্য। আমি আমাদের অস্টিন গাড়ির পেছনে লুকিয়ে রইলাম। কানুকে দেখতে পাচ্ছি। কানু বের হল। এবারে হাতে প্যাকেট নেই। আমি জানতাম কানু প্যাকেট নিয়ে বের হওয়ার সময় পাঞ্জাবি তুলে পেটের কাছে ঢুকিয়ে রাখে প্যাকেটটা। পেটটা খানিকটা উঁচু হয়ে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কানু চলে গেল পেছনের সেই সরু পথের দিকে। এখন কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। ওই পথে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ কমলাটে লালে আগুন হয়ে জ্বলছে। নির্জন পথে কানু ছাড়া আর কেউ নেই কোথাও। কানু গিয়ে শাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখার ভান করছে। আমি চুপি চুপি কৃষ্ণচূড়া গাছের পেছনে লুকিয়ে দেখছি সাইকেলে করে লোকটা আসে কি না! অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও লোকটা এল না! কানু উদ্বিগ্ন হয়ে ঘাড় উঁচু করে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেকটা দূর থেকে ফলওলা আসছিল। কানু ফলওলাকে দেখে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখার ভান করছিল। ফলওলা কাছাকাছি এসে কানুকে কী একটা জিজ্ঞাসা করাতে কানু হাসল। কোনও কথায় সায় দিচ্ছে মনে হল। তারপরে পাঞ্জাবি তুলে পেটের কাছে গুঁজে রাখা প্যাকেটটা বের করে লোকটার হাতে দিতেই অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেল। ফলওলা চট করে পিস্তল বের করে কানুকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিল। কানু লালে লাল কৃষ্ণচূড়া হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফলওলা প্যাকেট ফলের ঝুড়িতে নিয়ে দ্রুত মিলিয়ে গেল ওই দিকের রাস্তার দিকে! সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে আমার মুখে শব্দ করার কথা মনে নেই। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সম্বিত ফিরতে ছুটে বাড়িতে চলে আসি। নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় ঢুকে পড়লাম কানুকে মেরে দিল লোকটা? বুকটা থর থর করে কাঁপছিল। বাবাকে জানিয়ে দেব? না, তাহলে এতদিন ধরে আমি যে কানুর ব্যাপারটা জানি সেটা ফাঁস হয়ে যাবে! বেদম বকুনি খেতে হবে। তাছাড়া হত্যাকারী আমাকে চিনে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। কারণ আমি যে তাকে দেখেছি। ফের দেখলেই চিনে ফেলব! শত্রুর শেষ রাখতে নেই বলে আমাকেও বাঁচতে দেবে না!

একটুক্ষণ মুখ গুঁজে থাকার পরেই ঝট করে মনে হল কানু একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকেছিল ছোট ঘরে! ও কি সেটা নিয়েই বেরিয়েছিল? যদি সেটা নিয়ে বের হয়েছিল, তাহলে কী করতে এই দুপুরে চুপিচুপি বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল সবাইকে লুকিয়ে? চব্বিশ দিন ধরে আমাদের বাড়িতে কাজ করার সুবাদে ওর জানা ছিল এই সময়ে বাড়ি সুনসান থাকে! আমাদের বাড়ির দু'জন কাজের লোক জগদীশদা আর কপিলার মা দুপুরের দিকে বাড়িতে থাকে না ঘণ্টা খানেকের জন্য। জগদীশদা দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে পাড়ার দোকানে আড্ডা দিতে যায়। আর কপিলার মা দুপুরে না ঘুমিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গাবাড়ি মোড়ের মাথায় কপিলার বাড়িতে ঘুরে আসে। কানু জানে সে কথা। তাই এ সময়ে এসেছিল। কিন্তু ওর হাতে কিছু ছিল এ বিষয়ে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। যা এনেছিল সেটা যদি ছোট ঘরেই রয়ে যায়? যদি কেউ তার খোঁজ পায়? যদি সেই লোকটা সেটা নিতে আসে? না, না, তা হতে দেওয়া যাবে না। আমি নিজেকে সামলে নিলাম। কেউ দেখার আগেই ছোট ঘরে ঢুকে দেখতে হবে কানু কিছু রেখে গেছে কি না।

ঘরের মধ্যে কেমন গুমগুমে গন্ধ। ভয় ভয় করছিল আমার। আধ অন্ধকার ঘরে জিনিসপত্র স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। কানুর ব্যাগ এখানেই কি আছে? খুঁজে হয়রান হলাম। ব্যাগ নিয়ে আসেনি কানু তাহলে ওর প্যাকেট ট্যাকেট কোথায় রাখত ও?

আমাদের পুরনো কাঠের পরিত্যক্ত কাঠের আলমারিতে কি? ওটা হাবিজাবি সব জিনিসে ভর্তি। নিশ্চয়ই ওখানেই রাখতো কানু ওর অস্ত্রশস্ত্র। আলমারি খোলাই ছিল। একটু জোরে চাপ দিতে পাল্লা হাট হয়ে গেল। ভেতরে পুরনো কাগজপত্র। বই ইত্যাদি। হাটকে মাটকে কিচ্ছুটি পেলাম না। কী করবো ভাবতে গিয়ে নজরে এল আলমারির পেছন থেকে উঁকি মারা কানুর ধূসর ব্যাগটা। টেনে বের করে আনতেই চেইন খুলে ফেললাম। গোছা গোছা নোটের বান্ডিল ব্যাগের ভেতরে! এত টাকা!

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

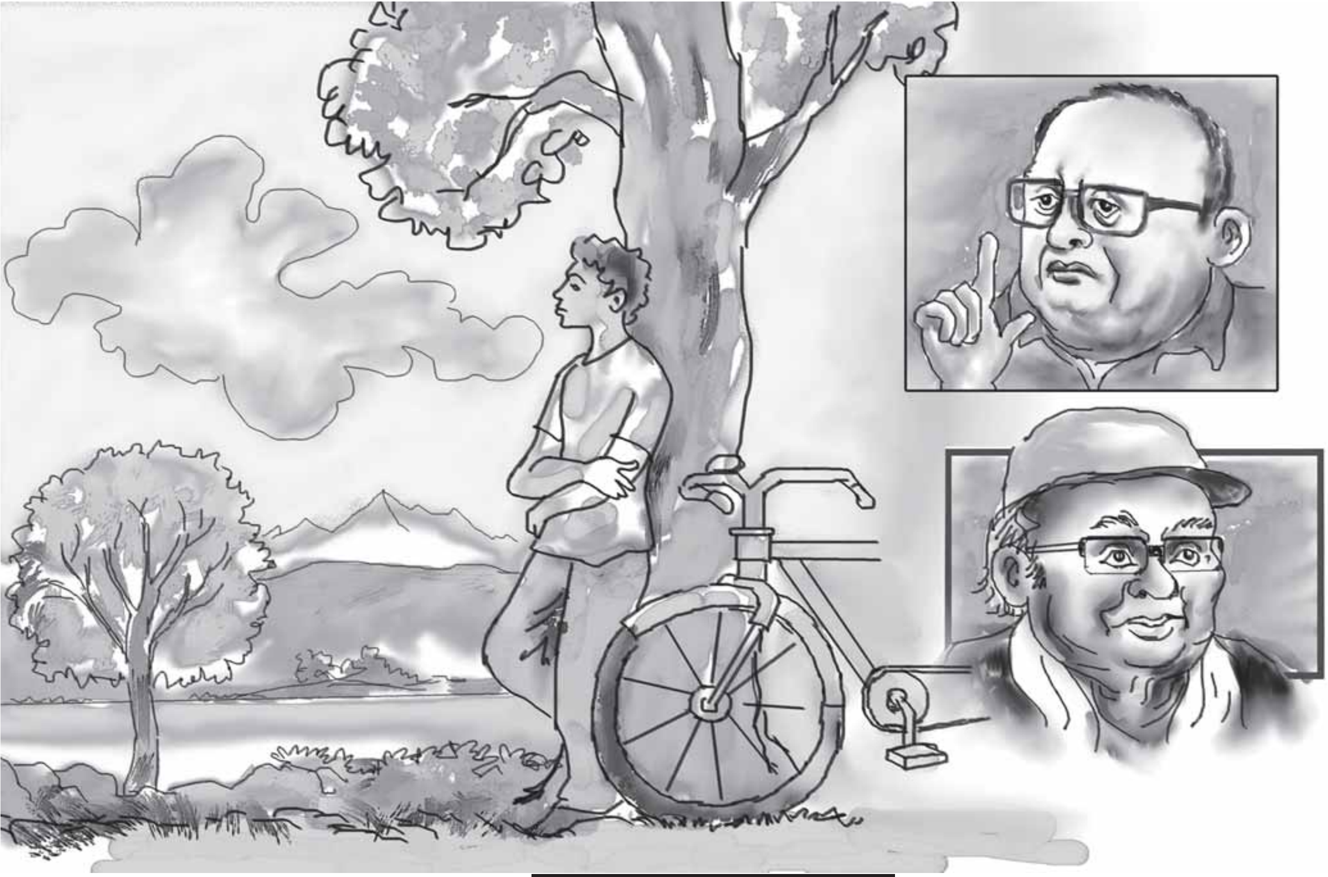

ডুয়ার্স থেকে শুরু

মেজরিটির মেজর এটি

বিরিয়ানিতে কখনও কখনও মাংসের চেয়ে মশলা মাখা আলুর স্বাদ হয় বেশি জোরদার। যেমন কিছু গল্পে বা সিনেমায় খোদ নায়কের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসায় বিশেষ কোনও পার্শ্বচরিত্র। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র অতি বিচিত্র। যে জন্যই হয়ত দারুণ ক্ষমতাবান অভিনেতাও, আজকের দিনে সেরা চরিত্রের বদলে, দীর্ঘ চরিত্রে সুযোগ পেলে বেশি খুশি হন। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সমরেশ মজুমদারের কিশোর নায়ক ‘অর্জুন’-কে নিয়ে তৈরি প্রথম সিনেমার বেলায়। আজকের পর্বে, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই শোনাচ্ছেন লেখক। যিনি আবার ওই সিনেমার চিত্রনাট্যকারও বটে।

স্নানটান সেরে রেডি হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই, অতি ব্যস্ততার মধ্যে হোটেল রুমের দরজা লক করে আমি সিঁড়ির দিকে ছুট লাগালাম। কিন্তু দশ পা যেতে না যেতেই ব্রেক কষতে হল, মাঝারি আকারের একটি হুঙ্কার শুনে,

—আরে এই যে! লম্ফ দিয়ে কোথায় ছুটছেন? খবরটা শোনেননি?

বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি হোটেল লাউঞ্জের দু'খানা সোফাতে মুখোমুখি বসে রয়েছেন দীপঙ্কর দে এবং মনোজ মিত্র। দু'জনেই পোশাক আশাক পড়ে শুটিং লোকেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। চুপচাপ প্রকৃতির মনোজবাবু যথারীতি কোলে একখানা বই খুলে ধরে তার পৃষ্ঠায় আত্মস্থ। আর দীপঙ্কর দে, অর্থাৎ টিটোদা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছেন আমার দিকে। বলাই বাহুল্য মিনি হুঙ্কারটি তারই কণ্ঠ নিঃসৃত।

—কীসের খবর?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। প্যাক আপের পর হোটেলে ফিরে কাল প্রায় রাত বারোটায় সোজা বিছানায় ঢুকে পড়েছিলাম। আর সকালে বিছানা থেকে বেরিয়েই টয়লেটে। অতঃপর সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় এই সবে আমি আজ প্রথম বাইরের জগতের মুখ দেখছি। মাঝের কয়েক ঘণ্টায় বিশ্ব সংসারে কী আবার পরিবর্তন ঘটে গেল কে জানে?

টিটোদা আমার জিজ্ঞাসু চাহনির উদ্দেশে জটিল ভ্রু ভঙ্গী করে বললেন, অতি ডেঞ্জারাস দুঃসংবাদ। বিমল গুরুং আজকে বন্‌ধ ডেকেছে। এই অবস্থায় তোমরা

লটবহর সমেত পাহাড়ে নিয়ে যাবে আমাদের? তারপর এতগুলো লোক যদি ওখানে গিয়ে আটকে পড়ি? ওই যা মরুভূমির মধ্যে লোকেশন... স্রেফ না খেয়ে মারা পড়ব তো হে!

এরপর, একদম টেলিপ্রিন্টার বা ফ্যাক্স মেশিনের মতো নন স্টপ বুলেটিনের খই ফুটে চলল তার মুখে। পাহাড়ে একবার বন্ধ ঘোষণা হলে কী কী বিপদ হতে পারে, তারই বিশদ ফিরিস্তি আর কী! এই কয়েকদিনের আলাপেই দেখেছি, অতি সহজে শঙ্কিত হয়ে পড়ার ব্যাপারে টিটোদা একেবারে অদ্বিতীয়। সুতরাং, পাহাড়ে বন্ধের মতো কুখ্যাত একটি বিষয় পেয়ে তিনি যে ভাল মতো চালিয়ে খেলতে শুরু করবেন, এ তো জানা কথাই।

এটা অবশ্য সত্যি, যে শুটিংয়ের জন্য প্রতিদিনই শিলিগুড়ি থেকে সেভক পেরিয়ে মংপং যেতে হচ্ছে আমাদের। ইউনিটের খাবারদাবার পর্যন্ত শিলিগুড়ি থেকে রোজই সেখান অবধি বয়ে নিয়ে যেতে হয়। সুতরাং, বন্ধের কল্যাণে গাড়ি চলাচল থেমে পড়লে একেবারে চিত্তির! তাই, শুটিং ভেস্তে যেতে পারে, এমন একটা টেনশন মনের ভেতরে অবশ্যই টিকটিক করছিল। কিন্তু সে দুশ্চিন্তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল টিটোদার আচরণ দেখতে দেখতে, আমার মনের ভেতরের চিত্রনাট্যকার সত্তাটির গোপন আপসোস। খালি মনে হচ্ছিল, ইস... এই ভদ্রলোক যদি ছবিতে সীতার পিতা না হয়ে, মেজরের চরিত্রটি করতেন, ব্যাপারটি কী পারফেক্টই না হত! চলনে বলনে এমন আদর্শ মেজর, আর দুটি হয় না।

কিন্তু আপসোসই সার। কারণ, ইউনিটের মেজরিটিই তো চেয়েছিল যে টিটোদা-ই মেজর হন। লেখক, ডিরেক্টর, প্রোডিউসার... সবাই। কিন্তু তা হয়ে উঠল না, এক অনিবার্য কারণে। একদিক থেকে দেখতে গেলে যে কারণ খুবই মাইনর... এবং আশ্চর্য কারণও বটে। চলুন, একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। একদম গোড়ার থেকেই ব্যাপারটা বলি।

একটা বয়সে মনে মনে আমরা অনেকেই ছিলাম সমরেশ মজুমদারের 'অনিমেষ'। অতি স্বপ্নালু একটি কিশোর ছেলে। যার শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের আংরাভাসা নদীর তীরে অখ্যাত কোনও চা-বাগানে। এবং প্রথম কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণ অবধি বয়সটা কেটেছে করলা ও তিস্তা নদীর পার ছোঁয়া জলপাইগুড়ি শহরে।

'উত্তরাধিকার' উপন্যাসের পাতায় পাতায় সেই জীবনযাপনের বিবরণ যত পড়েছি, ততই জড়িয়ে পড়ছি লেখকের বর্ণনার মায়াজালে। একা একা তিস্তার স্পার কিংবা টাউন ক্লাব সংলগ্ন ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালাতে চালাতে কতবার যে বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা পেরিয়ে চলে গিয়েছি নিজের সময়কাল থেকে অনিমেষের সময়কালে। তখন আমিই যেন ওই উপন্যাসের নায়ক কিশোরটি। আজকে স্বীকারোক্তি হিসেবে যতই হাস্যকর শোনাক, আমার তাতে কোনও লজ্জা নেই। কারণ, ওই কল্পনা করে তখন বড়ই সুখ পেতাম। বাস্তবের যাবতীয় সামান্যতা অতিক্রম করে যথার্থ অসামান্যতার এমন নিঁখুত অনুভব বাংলার আর কোনও মফস্‌সল শহরের কিশোরের কাছে এত সহজলভ্য ছিল বলুন? ভাগ্যিস সমরেশ মজুমদার 'উত্তরাধিকার' লিখেছিলেন!

মনে মনে অনিমেষ হয়েই মোহিতনগর টু বেরুবাড়ি, কিংবা তিস্তা ব্রিজ টু চাউলহাটি অবধি ভূগোল জুড়ে তখন চলত সাইকেল

একটা বয়সে মনে মনে আমরা অনেকেই ছিলাম সমরেশ মজুমদারের 'অনিমেষ'। অতি স্বপ্নালু একটি কিশোর ছেলে। যার শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের আংরাভাসা নদীর তীরে অখ্যাত কোনও চা-বাগানে। এবং প্রথম কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণ অবধি বয়সটা কেটেছে করলা ও তিস্তা নদীর পার ছোঁয়া জলপাইগুড়ি শহরে।

চষা। বিশেষতঃ যে সব জায়গায় শহর ফুরিয়ে ফাঁকা প্রান্তর শুরু, অর্ধেক আকাশ জুড়ে মোতায়েন নীল পাহাড় এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা, সেখানে কী প্রাণ ভরে যে এক একটা ঋতুর আদর মেখে নিয়েছি সমস্ত মন জুড়ে! আর অপেক্ষায় থেকেছি, কবে আবার সমরেশ মজুমদার তার সৃষ্ট নতুন কোনও চরিত্রকে এই পটভূমিকায় এনে ফেলবেন।

একদিন সেই চরিত্র এলোও। 'আনন্দমেলা' পত্রিকার পাতায়। সত্যসন্ধানী অমল সোমের শিষ্য, অর্জুন। যার সত্য সন্ধানের অভিযান আরম্ভ হল জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়া অঞ্চল থেকে। যদিও অর্জুনের বয়সে ওই শহরে আমরা বেশিরভাগ ছেলে (এবং মেয়েরাও) সাইকেলবাহন ছিলাম... সমরেশদা কিন্তু সিরিজের দ্বিতীয় কাহিনিতেই একখানা লাল টুকটুকে মোটরবাইক দিয়ে দিলেন অর্জুনকে।

অবশ্যই তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। কারণ কলেজ জীবনের শেষ ভাগ থেকে দেখলাম, সত্যিই আমাদের শহরে বাই-সাইকেলের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছে। বস্তুতঃ গোটা উত্তরবঙ্গের কোণে কোণে অচিরেই সর্বশ্রেণির মধ্যেই চার চাকা কিংবা বাইকের বাই এক সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করল। জীবন আর আটকে রইল না সাইকেলের স্পিডে। একটি পেট্রল চালিত যন্ত্রযান না হলে সবারই যেন স্ট্যাটাস যায় যায়। অথচ কারোরই ভাবার দায় নেই, ...এত এত পোড়া তেলের ধোঁয়া , দু' এক দশকেই গোটা ডুয়ার্সের মায়াবী ঋতুগুলোর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাবে।

জলপাইগুড়ি যে চিরকাল অনিমেষের জলপাইগুড়ি থাকবে না, বরং ক্রমশঃ স্বভাবে সুবিধায় কলকাতার কাছাকাছি হয়ে উঠতে চাইবে, সেটা আন্দাজ করেই বোধহয় সমরেশদা অর্জুনকে উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মানে, সাবেক উত্তরবঙ্গের যে নিজস্ব জংলা সৌরভ অনিমেষে আছে, লক্ষ্য করে দেখুন, অর্জুনের বেলায় তা যেন অনেকটাই অনুপস্থিত!

আর এই বিশেষ কারণটির জন্যই, যখন অর্জুনকে নিয়ে পরিকল্পিত প্রথম ছায়াছবির চিত্রনাট্য লেখবার সুযোগ পেলাম, আমার মধ্যের বেচারি জলপাইগুড়ি প্রেমী সত্ত্বাটি কিন্তু তখন সম্পূর্ণ সুখী হতে পারেনি। মন শুধু চেয়েছে অর্জুনের মধ্যে একটু অনিমেষকে মেশাই। গোপনে, চুপিসারে সে চেষ্টা যে করিনি, তাও নয়। কিন্তু মুশকিল হল যে, প্রতিটি স্ক্রিপ্ট মিটিং-এ অন্ততঃ আট দশজন করে মহা গলাবাজ ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। তারা যাহা যাহা নাকচ করেন, সেটাকে পুনর্বহাল করার মতো লড়াকু শক্তি আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না নিজের মধ্যে। আরে, পাবো কোত্থেকে? একে তো আমি একটু মুখচোরা গোছের লোক। তদুপরি, এক ঘর ভর্তি লোককে তার আগেই সদ্য সদ্য চেঁচিয়ে স্ক্রিপ্ট পড়ে শুনিয়েছি! গলা আমার রীতিমত ফ্যাসফ্যাস করছে!

একটু সমর্থনের আশায় করুণ চোখে তখন তাকাতে হয় পাশে বসা সমরেশদার দিকে। কারণ একটু জানি, তিনি হ্যাঁ বললে সেটাকে চট করে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কিন্তু ওনারও বয়স হয়েছে। মিটিং-এর শুরুতে তিনি অসম্ভব সজীব। আমার ল্যাপটপের ঢাকনির ওপর টকাস করে জোর টোকা মেরে 'নাও শুরু করো...' বলার সময় প্রচণ্ড উৎসাহে টগবগ করছেন। কিন্তু পড়া চলতে চলতে মিনিট কুড়ি পরে থেকেই ধরা পড়ে, তিনি একটু একটু ঝিমুচ্ছেন (এবং মৃদু নাকও ডাকছেন)। আড়চোখে তা দেখে তখন মনে মনে খুব

লজ্জিত হয়ে ভাবতে হয়... যাঃ! বড্ড বোরিং লেখা লিখেছি মনে হচ্ছে!

এটা অবশ্য মজা করে বলা। কারণ স্ক্রিপ্ট মিটিং-এর ওই পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই একাধিকবার আমাকে কড়া পরীক্ষায় পাস করতে হয়েছিল। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় পরীক্ষাটি ছিল, যেদিন প্রোডাকশন হাউস জনা কুড়ি নানা বয়সী পাঠককে ডেকে এনেছিলেন। তাদের সামনে ছবির প্রথম কয়েকটি দৃশ্য পড়ে শোনাতে বলা হয় আমাকে। আর ওই অর্জুন ফ্যানদের খোলাখুলি জানাতে বলা হয়, এই অর্জুন তাদের আদৌ পছন্দ হচ্ছে কি না। এটা তো আজ সবাই জানেন যে কোনও প্রকাশিত কাহিনি থেকে যখন সিনেমা তৈরি করা হয়, তখন গল্পে কিছু না কিছু অদলবদল ঘটেই। আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এখানে বলে রাখি যে আমার আগে আরও দু' একজন এই ছবির চিত্রনাট্য লেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেগুলো সবই একে একে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ফলে সবাই ধরে নিয়েছিল, আমার লেখার প্রচেষ্টাটিও নিয়মরক্ষা মাত্র। কারণ আগের লেখকদের তুলনায় আমার অভিজ্ঞতা তো বলতে গেলে একদম শূন্য। সুতরাং যথাসময়ে এই চিত্রনাট্যও বাতিল হয়ে যাবে।

সবার মধ্যে এই ধারণা থাকার ফলে আমার অবশ্য একটা সুবিধা হল। গল্পটি আমি কীভাবে ভাঙচুর করছি সে ব্যাপারে কেউ নাক গলাতে আসেনি। আর আমি চিন্তা করে দেখেছিলাম যে, অর্জুন যে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন দেশের সর্বত্র দূরদর্শন-ও চালু হয়নি। ফলে তখনকার পাঠকের কথা ভেবে গল্পটি একরকম চালে লেখা। কিন্তু আজ প্রায় পঁচিশ বছর পরে আমরা এমন রকেট গতিতে এগিয়ে এসেছি, যে কমপক্ষে হলিউডের 'ইন্ডিয়ানা জোন্স' সিরিজের ঢঙে চিত্রনাট্য ভাবা উচিৎ। তবেই হয়ত আজকের দর্শকরা ছবিটি উপভোগ করবে। অর্জুন সিরিজের পরের দিকের গল্পে স্বয়ং লেখকও অমন ধারার দিকে ঝুঁকেছিলেন, পাঠক মাত্রেই তা জানেন। এবং হাল আমলে 'ইয়েতি অভিযান' বা 'অ্যামাজন অভিযান'-এর মতো সিনেমাও ঠিক সেই পথটাই বেছে নিয়েছে।

তো, যাই হোক... নিজের মতো করে গল্পের আগামুড়ো বদলে লিখে ফেলেছিলাম দশখানা মতো সিন। সেদিনের ওই সমাবেশে সেগুলোই পড়ে শোনালাম। এবং তার ফলাফল ছিল খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক। কারণ, সিনগুলো লেখার সময় আমি নিজে যে মজা পেয়েছিলাম, দেখা যাচ্ছিল আমার পাঠ শুনে শ্রোতারা সবাই ঠিক সেই মজাটাই অনুভব করছে। এর চেয়ে বেশি আর কি চাই? ওই বাছাই করা অর্জুন ফ্যানরা সেদিন যে সমর্থন দিয়েছিলেন আমার ভাবনাকে... বলা যেতে পারে সেটাই এই কাজের থেকে আমার সবচেয়ে মূল্যবান প্রাপ্তি। কারণ, আদেগই বলেচি... গোটা চিত্রনাট্য শেষ করারর পথে এরপর পদে পদে অজস্র কর্তা ব্যক্তির আবদার পূরণ করতে হয়েছে আমাকে। সমরেশদা মিটিং-এ উপস্থিত থাকলে, তখন তারে একরকমের রূপ। আবার সমরেশদার অনুপস্থিতিতে একদম অন্যরকম। এই অভিজ্ঞতা থেকে একটাই খুব জরুরি জিনিস আমি শিখেছি। সেটা হল, যখন চিত্রনাট্য এক লাইনও লেখা হয়নি, একমাত্র তখনই লেখরের যত কদর। সবাই তখন এমন ভাব করে, যেন

অর্জুন
সিরিজের এক প্রচণ্ড রংচঙে
এবং সশব্দ চরিত্র হল মেজর।
টিনটিনে যেমন ক্যাপ্টেন হ্যাডক, ফেলুদায়
যেমন লালমোহনবাবু... বিরিয়ানিতে যেমন
মশলা মাখা আলু... অর্জুনের গল্পে মেজর খানিকটা
তাই। সমরেশদা চেয়েছিলেন ওই চরিত্রটি করুন
দীপঙ্কর দে। প্রোডাকশন হাউস থেকে সেই মতো
যোগাযোগও করা হয় ওনার সাথে। উনি রাজি,
জেনে আমার আহ্লাদের সীমা নেই। চোখের
সামনে ভাসছে 'বাঞ্ছারামের বাগান'
সিনেমাটি।

একা লেখকের ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে আছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে চিত্রনাট্যের শেষ লাইন লেখা সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তখন দেখা যায় সেই লেখক বেচারাই কোণঠাসা একা। আর বাকি সবাই মিলে, প্রচণ্ড বিজ্ঞতা ফলিয়ে লেখাটির ওপর নানা রকমের সার্জারি ও কসমেটির গ্রাফটিং করছে। সুতরাং খালি লিখলে হবে না। সেই লেখাকে রক্ষা করতে লেখককে যথেষ্ট লড়াকু হতে হবে!

আমাদের এই সিনেমাটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে সমরেশদা প্রায় ধমক দিয়ে আমায় বলেছিলেন, তুমি যে স্ক্রিপ্টটা শুনিয়েছিলে, সিনেমা তো দেখলাম সেটা অনুযায়ী বানানো হয়নি! এটা তুমি মেনে নিলে কী করে? এর জবাবে মনে মনে বলেছিলাম, লিখেছি তো লিখে আনন্দ পাওয়ার লোভে। সেই মোক্ষলাভ হয়ে যাওয়ার পরে কেন আর মিছে ঝগড়াঝাঁটি করা?

তো, লিখে আনন্দ লাভের কথা যখন এলই, তাহলে ফিরে আসি সেই চরিত্রটির কথায়, যাকে নিয়ে লিখে আমি সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছি। মেজরের কথায়।

এই অর্জুন সিরিজের এক প্রচণ্ড রংচঙে এবং সশব্দ চরিত্র হল মেজর। টিনটিনে যেমন ক্যাপ্টেন হ্যাডক, ফেলুদায় যেমন লালমোহনবাবু... বিরিয়ানিতে যেমন মশলা মাখা আলু... অর্জুনের গল্পে মেজর খানিকটা তাই। সমরেশদা চেয়েছিলেন ওই চরিত্রটি করুন দীপঙ্কর দে। প্রোডাকশন হাউস থেকে সেই মতো যোগাযোগও করা হয় ওনার সাথে। উনি রাজি, জেনে আমার আহ্লাদের সীমা নেই। চোখের সামনে ভাসছে 'বাঞ্ছারামের বাগান' সিনেমাটি। জমিদারের চরিত্রে দীপঙ্কর দে-র কমিক কীর্তিকলাপগুলো যত মনে পড়ে, ততই মনে হয়... চুলোয় যাক বাকি সব চরিত্র। পারলে চিত্রনাট্যের প্রতি দৃশ্যেই আমি মেজরকে ব্যবহার করি!

তেমনই আরেক জন সূক্ষ্ম অভিনেতা মনোজ মিত্র। বিষ্টুবাবুর চরিত্রের জন্য ওনাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। অর্জুনের শুরুর দিকের গল্পগুলোরয় যখন মেজর চরিত্রটি আসেনি, তখন এই বিষ্টুবাবুই কিন্তু ছিলেন বিরিয়ানির আলু! তবে মজাদার চরিত্র হলেও, বিষ্টুবাবু বয়স্ক মানুষ। তাই তাকে দিয়ে বেশি লম্ফঝম্প করানোয় অসুবিধে আছে। সেই কারণেই হয়ত পরের দিকের গল্পে বিষ্টুবাবুর সূত্রেই আমেরিকা থেকে মেজরের আগমন। এবং হম্বিতম্বি, হাঁক ডাক ও নির্মল সারল্যের জন্য, সেই চরিত্র শিগগিরিই পাঠকদের কাছে দারুণ প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এতটাই প্রিয়, যে সিনেমার জন্য আমরা সিরিজের প্রথমদিকের গল্প (কালিম্পং-এ সীতাহরণ) নির্বাচন করলেও, মেজরিটির দাবী মেনে মেজরকে সেই গল্পেই এনে ফেলার ব্যবস্থা করতে হয়। আমার জন্য সে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। একে তো বিরিয়ানিতে ডবল বিষ্টুবাবু প্লাস মেজর। তার ওপর আবার মেজরের চরিত্রের জন্য আমি স্বাধীনভাবে আমার নিজের মতো করে গল্প তৈরি করতে পারব!

সেই মতোই, মূল চিত্রনাট্যে আমি অনেকগুলি মৌলিক দৃশ্য লিখেছিলাম মেজর আর বিষ্টুবাবুকে নিয়ে। ভাগ্যক্রমে, ছবি তৈরির সময় সেইসব দৃশ্যের একটাতেও কোনও কাটাকুটি করা হয়নি। যার জন্য হয়ত ধন্যবাদ প্রাপ্য মনোজ মিত্রের। কারণ প্রথম বছর কলেজ সোশ্যালে মনোজবাবুর লেখা নাটক পরিচালনা করেই আমার এই শিল্প

মাধ্যমের সাথে প্রথম পরিচয়। এবং ওনার লেখা সরস সংলাপের প্রেমে পড়েই পরের বছরের সোশ্যাল কমেডি নাটক ও কমেডি সংলাপ লেখার হাতেখড়ি। তাই, সেই শিক্ষার প্রেরণায় কমেডিটা বোধহয় অকাট্য-ই লিখেছিলাম!

আমাদের শুটিং শুরুর মাসখানেক আগে পুরো টিমকে নিয়ে একটা পিকনিক হয়েছিল বৈদিক ভিলেজের এক বাগান বাড়িতে। সেখানেই আমার লেখা (তখনও অপরিবর্তিত) বাঁধানো চিত্রনাট্যখানার কপি মনোজ মিত্র-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। মনে আছে, তার কাছে গিয়ে ঢোঁক গিলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলেছিলাম, আপনার নাটক পড়েই দৃশ্য আর সংলাপ লেখার প্রাথমিক সাহস পেয়েছি। প্লিজ, এই স্ক্রিপ্টটা পড়ে একটু বলবেন, আপনার কী মনে হয়।

মনোজবাবু কোনও মন্তব্য করেননি। না সেদিন, না তার পরে। তবে টিটোদা মেকআপ টেস্টের দিন স্ক্রিপ্ট বগলে করে এলেন এবং সেই কাগজের তাড়াটি থাবড়ে জোর গলায় বললেন, জিনিসটা কিন্তু খাসা দাঁড়িয়েছে। ঠিক মতো করলে, এ ছবি জমে যাবে!

শুনে আমি তো আহ্লাদে আটখানা! আহা কী আনন্দ! এমন প্রবীণ একজন অভিনেতা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। পরিশ্রম আমার একেবারে সার্থক! কিন্তু এরপরেই ঘটল বিনা মেঘে বজ্রপাত। কারণ, টিটোদা ঘোষণা করলেন মেজরের রোলটা উনি করবেন না। করবেন, সীতার পিতা, মি. রায়ের চরিত্র।

আমি তো একেবারে হতভম্ব। মাথা খুঁড়েও ওনার আপত্তির কারণ বুঝতে পারছি না। শুধু ইউনিটের কতিপয় অভিজ্ঞ পুরনো লোক বোধহয় কারণটা সেদিনই আন্দাজ করতে পেরেছিল। তার ইঙ্গিত ছিল তাদের মুখ টেপা হাসিতে। আমি নিজে অবশ্য, সে রহস্যটা ধরতে পারলাম বেশ কয়েক দিন পরে। যখন স্ক্রিপ্ট থেকে সহকারী পরিচালকরা শুটিংয়ের শিডিউল বানিয়ে আর্টিস্টদের ডেট কাউন্ট করছিল। দেখা গেল ছবিতে মেজরের চেয়ে মি. রায়ের চরিত্রটির উপস্থিতি রয়েছে অনেক বেশি সংখ্যক দৃশ্যে। অর্থাৎ ওই চরিত্রের অভিনেতার কাছ থেকে প্রোডাকশন ম্যানেজারকে অনেক বেশি ডেট নিতে হবে। সুতরাং হতেই পারে, যে ওই অঙ্কের ফারাক বুঝেই টিটোদা 'বাণিজ্য বসতেঃ লক্ষ্মী' আপ্তবাক্যটি স্মরণ করেছিলেন। অর্থকরী দিক থেকে, মেজরের চেয়ে সিনেমার ভিলেনের চরিত্রটি করা তার জন্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি লাভজনক ছিল!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

ডুয়ার্সের হাতি হাতির পাঁচালি

'... ওদিক হইতে একটা হাতির গর্জন শোনা গেল। হাতিটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকলি ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত রহমৎ প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে অতি মৃদু অনুযোগের সুরে বলিল, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে। হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী। বিশ্বম্ভরবাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল মতি। মতি একটা চিতাবাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। রায় হাতিতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া। রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, এখন নয় মা। ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মী মেয়েটির মতো শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ছোটগিন্নী শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে রায় বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে।' —**জলসাঘর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**

সেপ্টেম্বর মাসে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ক্ষিপ্ত একটি কুনকি হাতি পিষে মেরেছিল তার মাহুতকে। সেই ঘটনার রেশ মন থেকে মিলিয়ে যেতে না যেতেই সম্প্রতি জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে ফের কুনকি হাতির রোষে পড়ে জখম হলেন অস্থায়ী মাহুত ওমপ্রকাশ নায়েক। মেনকা নামে একটি হাতিকে হলং নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওমপ্রকাশ। তাঁর সঙ্গে আরও একজন মাহুত ছিলেন। ফেরার পথে, শিশামারা বিট এলাকায় মাঝরাস্তায় হাতিটি দাঁড় করিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়েছিলেন। তখনই হাতিটি ওমপ্রকাশকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়। দাঁত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তাঁকে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওমপ্রকাশকে মাদারিহাট ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

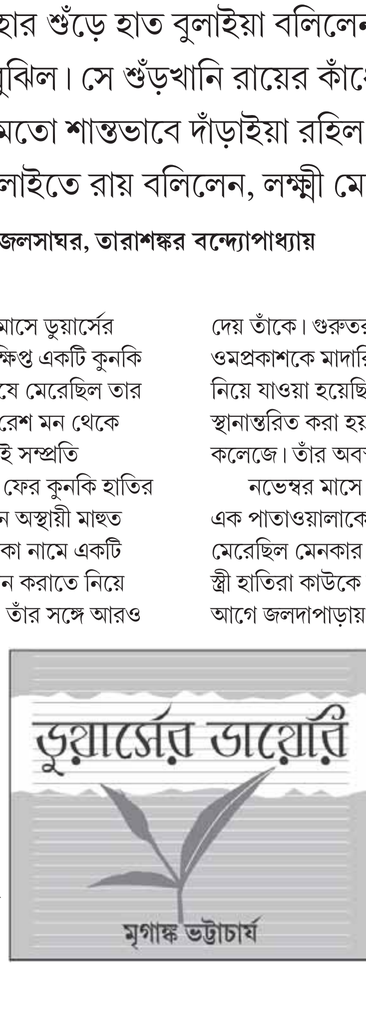

নভেম্বর মাসে জুলিয়াস খড়িয়া নামে এক পাতাওয়ালাকে পায়ের নিচে পিষে মেরেছিল মেনকার ছেলে মৈনাক। সচরাচর স্ত্রী হাতিরা কাউকে আক্রমণ করে না। এর আগে জলদাপাড়ায় যত ঘটনা ঘটেছে সবক্ষেত্রেই পুরুষ হাতির শিকার হয়েছেন মাহুত ও পাতাওয়ালারা। এই প্রথম স্ত্রী হাতির হামলার কারণে প্রশ্ন উঠছে মাহুতদের মধ্যে। ওমপ্রকাশের বাবা শিবলাল মারা গিয়েছিলেন গতবছর।

টারজান নামে একটি কুনকি হাতিকে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে গন্ডারের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিলেন শিবলাল। তাঁর জায়গাতেই বন দপ্তর তাঁর পুত্র ওমপ্রকাশকে অস্থায়ীভাবে কাজে নিয়োগ করেছিল বন পাহারার কাজে। গত দুই বছরে জলদাপাড়ায় কুনকি হাতি ও গন্ডারের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ছয়জন বনকর্মী, মাহুত ও পাতাওয়ালার।

আমাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে জলদাপাড়ার জঙ্গল দেখার আনন্দ। কাজিরাঙা, আমেরফোর্ট কিংবা কানহার মতো ভারতবর্ষের অন্যান্য অভয়ারণ্যের মতো ডুয়ার্সের জলদাপাড়াতে হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল সাফারি এক আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা। নিরাপদে থেকেও গা ছমছমে গভীর অরণ্যের এবং বিভিন্ন বন্য জন্তু জানোয়ারের দেখা পাওয়ার জন্য এলিফ্যান্ট সাফারির চেয়ে ভাল কিছু হয় না। এই শীতেই সেরা সময় হাতির পিঠে চেপে অরণ্যের সুন্দরকে উপভোগ করার জন্য। প্রশ্ন জাগে, সেই জলদাপাড়াতেই এমন কাণ্ড কেন হচ্ছে বারবার?

বনকর্তারা বলছেন, যাঁরা হাতির সঙ্গে থাকছেন তাঁরা বেশিরভাগই নতুন। এঁরা হাতির ভাষা বোঝন না। হাতির সঙ্গে আত্মীয়তায় ঘাটতি রয়েছে প্রচুর। হাতির যত্নাত্তিতেও খামতি থাকছে। তবে মাহুত ও পাতাওয়ালাদের স্থায়ীকরণ বা বেতন ঠিকমতো না মেলা নিয়ে কুলুপ এঁটেছেন সকলেই। খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল মাহুতদের কুড়িটি স্থায়ীপদ যে বহু বছর ধরে শূন্য হয়ে পড়ে আছে তার হদিসই নাকি ছিল না বনদপ্তরের কাছে। সম্প্রতি মাহুতদের প্রশিক্ষণের সময় বনমন্ত্রীর কাছে জানাবার পর ফাইল চালাচালি শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর পাতাওয়ালা বলে যে কর্মী আছেন সে খবর জানাই ছিল না অর্থমন্ত্রকের। ঘাস কাটার বনকর্মীদের ভাবা হত পাতাওয়ালা। অথচ হাতিদের পরিচর্যায় এই পাতাওয়ালাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। জলদাপাড়ার জঙ্গলে গত দু'বছরে পরপর বেশ কিছু পাতাওয়ালা ও মাহুতের জীবনহানির ঘটনায় চরম হতাশা গ্রাস করেছে তাঁদের। কাজে যেতেও আশঙ্কায় রয়েছেন তাঁরা। এখানে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণকেন্দ্রের দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের সেরা আকর্ষণ এলিফ্যান্ট সাফারি। পর্যটকেরা বন দপ্তরের কুনকি হাতির পিঠে চেপে দেখতে যান গভীর জঙ্গল। পর্যটকদের পিঠে নিয়ে বড় উঁচু ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে সাফারি। কারণ সেখানেই থাকে জলদাপাড়ার এক-সিংওয়ালা গন্ডার। ভাগ্য ভাল থাকলে চোখে পড়ে যায় প্রায়শই। দিনে দু'বার এই দুঃসাহসিক অভিযানের স্বাদ নিতে পারেন পর্যটকেরা। ভোরে একবার। বিকেলে আর একবার। একটি হাতিতে চারজন করে পর্যটক বসতে পারেন। পরের দিনের সাফারির জন্য অভয়ারণ্যের লাগোয়া বন দপ্তরের অফিসে আগের দিন বিকেলে বুক করে রাখাই নিয়ম। জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির এই এলিফ্যান্ট সাফারি সমস্ত সাধারণ টুরিস্টদের জন্য উন্মুক্ত। অবশ্য হলং ও মাদারিহাট বনবাংলোর পর্যটকেরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

সংবাদপত্রে এখন নিয়মিত আসতে শুরু করেছে লাটাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়ক। ২৩ নভেম্বর বিকেল তিনটে নাগাদ এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি দাঁতাল হাতি। সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকা এই হাতিটির ছবি তুলতে গিয়ে ও হাতিটিকে স্যালুট জানাতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল সিদ্দিক রহমান নামে এক ব্যাংক কর্মীর। তারপর থেকে ওই পথে জাতীয় সড়কের ওপর কয়েকবার দেখা মিলেছে ওই খুনি দাঁতালের। সুরশ্রুতি ঝিলে প্রবেশ করার রাস্তাতেও তাকে দেখেছেন বন দপ্তরের কর্মীরা। শূন্যে গুলি করে ও পটকা ফাটিয়ে রাস্তা থেকে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়েছেন তাঁরা।

হাতি এবং মানুষের মধ্যে একটা চিরাচরিত দ্বন্দ্ব আছে। জঙ্গলে খাবারের অভাব হলে হাতির দল গ্রামে গঞ্জে হানা দিয়ে থাকে। ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল আর শস্য নষ্ট হয়। ইদানিং হাতির সেই প্রবণতা বেড়েছে। জনপদে ঢুকে এসে ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে হাতির দল। এই সময় হাতিদের শান্ত করতে বা তাদের আটকাতে গিয়ে মানুষকে একরকম যুদ্ধই করতে হয়। পাশাপাশি জঙ্গলে গিয়েও হাতি শিকারের কথা কারও অজানা নেই। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ডুয়ার্স এলাকায় জঙ্গল পার হয়ে লোকালয়ে বা অন্যত্র যেতে গিয়ে প্রচুর হাতি ট্রেনে কাটাও পড়েছে। সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে প্রতি বছর ভারতে গড়ে তিনশো মানুষ মারা যায় হাতির জন্য।

এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। বাড়ছে জনবসতি। জঙ্গল কেটে বাসযোগ্য জমিতে ঘরবাড়ি তৈরি করছে মানুষ। শুধু তাই নয় জঙ্গল কেটে সেই জমিতে চাষ করছে, গড়ছে বিভিন্ন শিল্প, তৈরি করছে নানারকম কল-কারখানা, বড় বড় কমপ্লেক্স, ড্যাম। ফলে এশিয়ার জঙ্গলে বসবাসকারী হাতির সংখ্যা ক্রমশ কমছে। এদিকে হাতি সংরক্ষণ কেন্দ্র বা ন্যাশনাল পার্কগুলিতে যেখানে হাতিদের সযত্নে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলি এতটাই পরিসরে ছোট যে সব হাতিকে ঠিকভাবে সেখানে রাখা সম্ভব নয়।

হাতির বেআইনি শিকার ও ব্যবসার কথাও ভুলে গেলে চলে না। হাতির দাঁত অত্যন্ত দামি একটু বস্তু। তাই বেশির ভাগ পুরুষ হাতি, যাদের দাঁত রয়েছে, অকাতরে শিকার করা হয়। সেই সব হাতির দাঁত বেআইনি পাচার হয় বাইরে। হাতির দাঁত থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের শৌখিন জিনিসপত্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দাঁতাল পুরুষ হাতির সংখ্যা দিন দিন কমছে। দক্ষিণ ভারতের প্রায় নব্বই শতাংশ হাতিরই দাঁত রয়েছে। ওদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে হাতি মেরে তার মাংস খাবার চল রয়েছে। ফলে এই দুই কারণেই আমাদের দেশে হাতির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হাতির দাঁতের ব্যবসা যদিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবুও বস্তুত হাতির দাঁতের বেআইনি কারবার ধনধান্যে বাড়ছে। দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান নাকি হাতির দাঁতের চোরাই ব্যবসার পোক্ত ঘাঁটি। মূলত আফ্রিকার হাতির দাঁত দিয়ে এই ব্যবসা গড়ে উঠলেও এশিয়া থেকেও হাতির দাঁতের নিয়মিত যোগান যায়। শোনা যায়, আমাদের ডুয়ার্সের জঙ্গলেও ছড়িয়ে রয়েছে এই আন্তর্জাতিক র‍্যাকেট।

শৌখিন জিনিসপত্রের জন্য যেভাবে মানুষ হাতি শিকার করা শুরু করেছে তাতে আগামী দিনে হাতির সংখ্যা আরও কমবে। হাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত, ভিয়েতনাম, মায়ানমারে হাতি শিকার রীতিমত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে দাঁতাল পুরুষ হাতিদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু বংশগত কারণও

শৌখিন জিনিসপত্রের জন্য যেভাবে মানুষ হাতি শিকার করা শুরু করেছে তাতে আগামী দিনে হাতির সংখ্যা আরও কমবে। হাতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত, ভিয়েতনাম, মায়ানমারে হাতি শিকার রীতিমত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে দাঁতাল পুরুষ হাতিদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু বংশগত কারণও আছে। অনেক সময় দেখা যায় ছোট হাতিদেরও মেরে ফেলা হয় তাদের ছোট ছোট দাঁতের জন্য।

আছে। অনেক সময় দেখা যায় ছোট হাতিদেরও মেরে ফেলা হয় তাদের ছোট ছোট দাঁতের জন্য। ফলে জঙ্গলে পুরুষ ও স্ত্রী হাতির অনুপাতের ভারসাম্য অনেকটাই কমবেশি হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী হাতিদের প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে সে কারণে। এশিয়ায় হাতির সংখ্যা কমে যাওয়ার পিছনে এটাই মূল কারণ।

হাতি নিয়ে কেজো আলোচনা হচ্ছিল। এবার স্বাদ বদলাতে একটু বাংলা সাহিত্যের দিকে প্রসঙ্গ ঘোরানো যাক। তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' উপন্যাস থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিয়ে শুরু হয়েছিল এবারের ডায়েরি। এবার একটিবার বিভূতিভূষণের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করছে। ১৯৪১ সালে রচিত 'অভিযাত্রিক'-এ বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'হাতির দাঁতের ক্ষুদ্র নারীমূর্তি আমার কী ভালোই লেগেচিল! চার-পাঁচ ইঞ্চির বেশি বড় নয় পুরোনো হাতির দাঁত, হলদে হয়ে গিয়েচে - কী কমনীয়তা আর জীবন্ত লাবণ্য মূর্তিটির সারা গায়ে। বারবার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। শুনলাম এক সময়ে এখানে হাতির দাঁতের জিনিসপত্রের ভালো শিল্পী ছিল। এই ক্ষুদ্র মূর্তিটি কোনও অজ্ঞাত কারিগরের শিল্পপ্রতিভার অবদান জানিনে, মন কিন্তু তার পায়ে আপনিই শ্রদ্ধা নিবেদনে ব্যগ্র হয়ে পড়ে'। কিশোর উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'-এও রয়েছে হাতির বর্ণনা। 'সে রাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলে সে। চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল। বুনো হাতির দল মড় মড় করে বাঁশ ভাঙছে। একবার সত্যিই সে যেন বুনো হাতির গর্জন শুনতে পেল। সমস্ত বনটা কেঁপে উঠল।'

উপেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের লেখাতেও বহুবার এসেছে হাতির প্রসঙ্গ। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৬২ সালে লেখা 'কর্ণাটরাগ' হাতি নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যে একটি অনবদ্য উপন্যাস। নীলগিরি উপত্যকার উটি থেকে চল্লিশ কিমি নিচে মহীশূরের গুডালুর অঞ্চলের পশ্চিমে প্রাচীণ কর্ণাটকদেশের বিস্তীর্ণ অরণ্য এই আখ্যানের পটভূমি। জানা যায়, প্রাচীনকালে হাতি-শিকারের পর রাজাকে ঘিরে চারণকবিরা যে প্রশস্তি সংগীত গাইতেন, তা-ই কর্ণাট রাগ। কিন্নর রায়ের ১৯৯৫ সালে লেখা 'মেঘপাতাল' উপন্যাসেও এসেছে হাতি সম্পর্কিত কথা। জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে বানানো হয়েছে গ্রাম, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বসতি, হাতির চলার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বানানো হয়েছে চাষের খেত, মদের দোকান, ভিডিও হল। বাসস্থানের অভাবেই দলমা পাহাড় থেকে লোকালয়ে নেমে এসেছে হাতিরা। বাসভূমি বিচ্ছিন্ন হয়ে না খেতে পেয়ে তারা গুন্ডা হাতি হয়ে গিয়েছে। সাবু নামের একটি অলীক কথক চরিত্রের ভিতর দিয়ে লেখক পরিবেশের কথা, রাষ্ট্রজীবনের ভিতর মানুষের দুঃখের কথা শুনিয়েছেন। সাবু শেষ পর্যন্ত হাতির দলেই মিশে যায় আর হয়ে ওঠে মিথের অংশ। হাতি নিয়ে আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস সৈকত রক্ষিতের 'বৃংহণ'।

বাংলা সাহিত্যে 'হাতি' নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসের কথা টানতে হয়। হাতির এমন অনুপঙ্খ বিবরণ বাংলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। সেই উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে হাতি সংক্রান্ত কথা। 'আসামের জঙ্গলে মোগল তোপখানার ভারী ভারী কামান বয়ে নিয়ে যেতে হাতির খুব দরকার। খুন্তাঘাটের কাছাকাছি বকির খান পাইকদের নিয়ে হাতি ধরছিলেন। কয়েকটা হাতি বন্দীও হয়। পাইকদের গাফিলতিতে কিছু হাতি পালিয়ে যায়। কিন্তু হাতিখেদা সর্দারকে বকিরর খান ফাঁসি দেন। তিনি হুকুম দিলেন, হয় পালিয়ে যাওয়া হাতিদের ধরে নিয়ে আসো, নয়তো হাতি পিছু হাজার রুপেয়া দাও।' এই উপন্যাসে শ্যামল বারবার এনেছেন হাতির প্রসঙ্গ। একটা অধ্যায় শুরু হয়েছে এইভাবে —'পাশাপাশি দুই হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটি হাতি অন্যটির চেয়ে বেশি উঁচু। গায়ের রং ঘোর কালো। শীতকালের সনধ্যে রাতে অকালবৃষ্টিতে মশালের দাপানো শিখা মুছে যাওয়ার জোগাড়। তাতেও লক্ষ করলে দেখা যাবে হাতিটির দুটি চোখই হলুদ বর্ণ। ডান কানের পাশে একটি বড় মতো আঁচিল। এই হাতিটির নাম ফিল-ই-ফতে। বেহেদের জাতের হাতি। শাহেনশা শাহজাহানের পেয়ারের হাতি। পাশের হাতিটিকে দেখে মনে হবে ফিল-ই-ফতেরই ছেলে। বয়সও কম। ছাই ছাই গা। গলঘন্টটি ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে সামান্য দুলতেই ঢং টিম - এইসব আওয়াজ হচ্ছিল। এর নাম ফতে জং। শাহজাদা দারাশুকোর পেয়ারের হাতি। বলা যায়, এখন ফতে জংয়ের লড়াই হামলার বয়স, যাকে বলে হাতিঘেঁষা ভাষায় ওর এখন কেলরা দশা'।

কবি রণজিৎ দাশের 'হাজার বছরের ভারতীয় কবিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এবার ইতি টানব আমরা। সেই বইতে তিনি বলেছেন— 'শুনেছি যে হাতির ছানা গর্তে পড়লে মানুষেরা যদি তাকে উদ্ধার করে, তাহলে সেই উদ্ধারের প্রমাণটুকুও মুছে দিতে হয়। তাকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেবার আগে, ওই ছানার নিজস্ব বিষ্ঠা সতর্কভাবে তার সর্বাঙ্গে লেপে তার শরীর থেকে মানুষের হাতের গন্ধ নিশ্চিহ্ন করে দিতে হয়। নতুবা জঙ্গল তাকে গ্রহণ করে না'।

কোচবিহারে তোর্ষা তরঙ্গ পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশিষ্টদের সংবর্ধনা

গত ৩ ডিসেম্বর রবিবার কোচবিহার রেডক্রশ ভবনে মেদিনীপুরের আর্ট টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ও মুর্শিদাবাদের সৈয়দ আহাসান আলী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এবং কোচবিহারের তোর্ষা তরঙ্গ পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় বাংলার বিভিন্নপ্রান্তের ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এঁরা হলেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাট্যকার সুনীল সাহা। রংধনু পত্রিকার সম্পাদক জয়নুল আবেদিন, 'অযোগবাহবর্ণ' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি মাধবী দাস, বিবৃতি পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস দাস, মেঘলাআকাশ পত্রিকার সম্পাদক আফছার আলী, সাহিত্যিক তুলসী দাস, বিদ মহাশয়কে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা, কবি গৌতম ভাদুড়ি, বিশিষ্ট সাহিত্য পৃষ্ঠপোষক গোকুল সরকার ও সৈয়দ শীষমহাম্মদ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পী অঞ্জনা রায় সহ অনেকে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কোচবিহারের বেশ কয়েকজন কবি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিধান ঘোষ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব

ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতি ও ডুয়ার্সের পর্যটনকে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে আলিপুরদুয়ারে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব। ১০ ব্যাপী এই উৎসব চলবে ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স উৎসব সমিতি এবছর তাদের ১৪তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন করেছে। স্থানীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের বিশাল জায়গা জুড়ে তৈরি হবে চারটি আলাদা মঞ্চ। উত্তরবঙ্গের কোচ, মেচ, রাভা, অসুর ইত্যাদি বিভিন্ন যে সব জনজাতি রয়েছে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনুষ্ঠান উপস্থাপন করবে লোকসংস্কৃতি মঞ্চে। শিশুদের মঞ্চে প্রায় তিন হাজার শিশু প্রতি বছরের মতো এবারেও তাদের নাম, গান, ক্যুইজ, আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করবে। সাধারণ সাংস্কৃতিক মঞ্চে অর্থাৎ মূল মঞ্চে হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর একটি মঞ্চে চলবে একে দিন একেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা, ক্যুইজ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুপ চক্রবর্তী জানালেন, এবার গানে মঞ্চ মাতাবে জি বাংলা খ্যাত তাদের ঘরের দুই ছেলে মেয়ে দীপায়ণ আর বন্দনা। আসছেন কলকাতার সুপর্ণা কর্মকার, সহজ মা, পটা, অরুণাভ রায়, পূজা সরকার, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ বর্মণ, ক্যাকটাস, মুম্বাইয়ের অন্তরা মিত্র আর কুমার শানু। থাকছে ভুটানের মুখোশ নৃত্য। শ্রীখোল বাদক হরেকৃষ্ণ হালদারের বোল দর্শক ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে বলেও জানালেন তিনি। বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে থাকবে প্রায় ৭০০ মতো বিভিন্ন স্টল। তাতে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ, নেপাল থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্টল থাকবে সেখানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মন্ত্রী ও প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তিরা। এক কথায় শীতের মরশুমে এই দশ দিন আলিপুরদুয়ার থাকবে একেবারে জমজমাট।

নিজস্ব প্রতিবেদন

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

উত্তরকন্যায় গ্যালারির সামনে শৌভনিক চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ারকে চিনুন শৌভনিকদের চোখে

আলিপুরদুয়ার মানেই পর্যটকের কাছে দুটি মূল শব্দ — জঙ্গল আর জনজাতির অসাধারণ বৈচিত্র্যভূমি। সরকার চাইছেন, প্রাচীন অরণ্যে ঘেরা আর আদি মানব গোষ্ঠীতে সমৃদ্ধ রাজ্যের এই নবীন জেলাটিকে বাইরের উৎসাহী পর্যটকের সামনে ঠিকঠাক তুলে ধরা হোক। আর সেই উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি শিলিগুড়ির 'উত্তরকন্যা'-য় সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফটো গ্যালারি। উদ্যোক্তা জেলার পর্যটন ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ। আর গ্যালারি সাজানো হয়েছে অসামান্য সব ছবি দিয়ে, সেসব ছবি মিলেছে ডুয়ার্স ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সৌজন্যে।গোটা পঞ্চাশেক ছবি রয়েছে সব মিলিয়ে, যার বেশিরভাগটাই তোলা সংস্থার প্রেসিডেন্ট শৌভনিক চক্রবর্তীর। পেশায় সরকারি কর্মচারী শৌভনিকের নেশা ছবি তোলা, বলাই বাহুল্য। মুলত বন্যপ্রাণ আর আদিবাসীদের ছবি তোলেন শৌভনিক। আদ্যন্ত ডুয়ার্সের মানুষ, ফটোগ্রাফার ছাড়াও ন্যাচারালিস্ট এবং এক্সপ্লোরার বলা যায় তাঁকে। সুলেখক হিসেবেও পরিচিতি আছে তাঁর, 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা ও ছবি। ছবিতে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত শৌভনিক কিন্তু স্বভাব-লাজুক, আত্মপ্রচার নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তাঁর।

'গ্যালারি আলিপুরদুয়ার' মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের অপেক্ষায়। তার আগে মানুষকে সেইসব দুর্দান্ত ছবির নমুনা দেখাবার লোভ সামলাতে পারল না 'এখন ডুয়ার্স'। শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'আলিপুরদুয়ার' বইটি, তার পাতায় থাকছে সেইসব দুর্মূল্য ছবি, আর নির্বাচিত কয়েকটি হাজির হচ্ছে নতুন বছরের ক্যালেন্ডারে। যা শুনে অনেককেই নাকি মন্তব্য করতে শোনা যাচ্ছে, এবার ক্যালেন্ডার নিয়ে ধুন্ধুমার হচ্ছেই। সে যাই হোক না কেন, বইয়ে কিংবা ক্যালেন্ডারে বা গ্যালারিতে, আলিপুরদুয়ারকে মানুষ আরও নিবিড়ভাবে চিনতে পারবেন শৌভনিক ও তাঁর সঙ্গীদের তোলা ছবিতেই। শৌভনিক জানালেন, আগাগোড়া পিছিয়ে থাকা আলিপুরদুয়ার এক ধাক্কায় যেন এগিয়ে এল অনেকটা, আর 'নিজেদের বাসভূমিকে নিজেরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি' একথা ভেবেই গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে তাঁদেরও।

নিজস্ব প্রতিবেদন

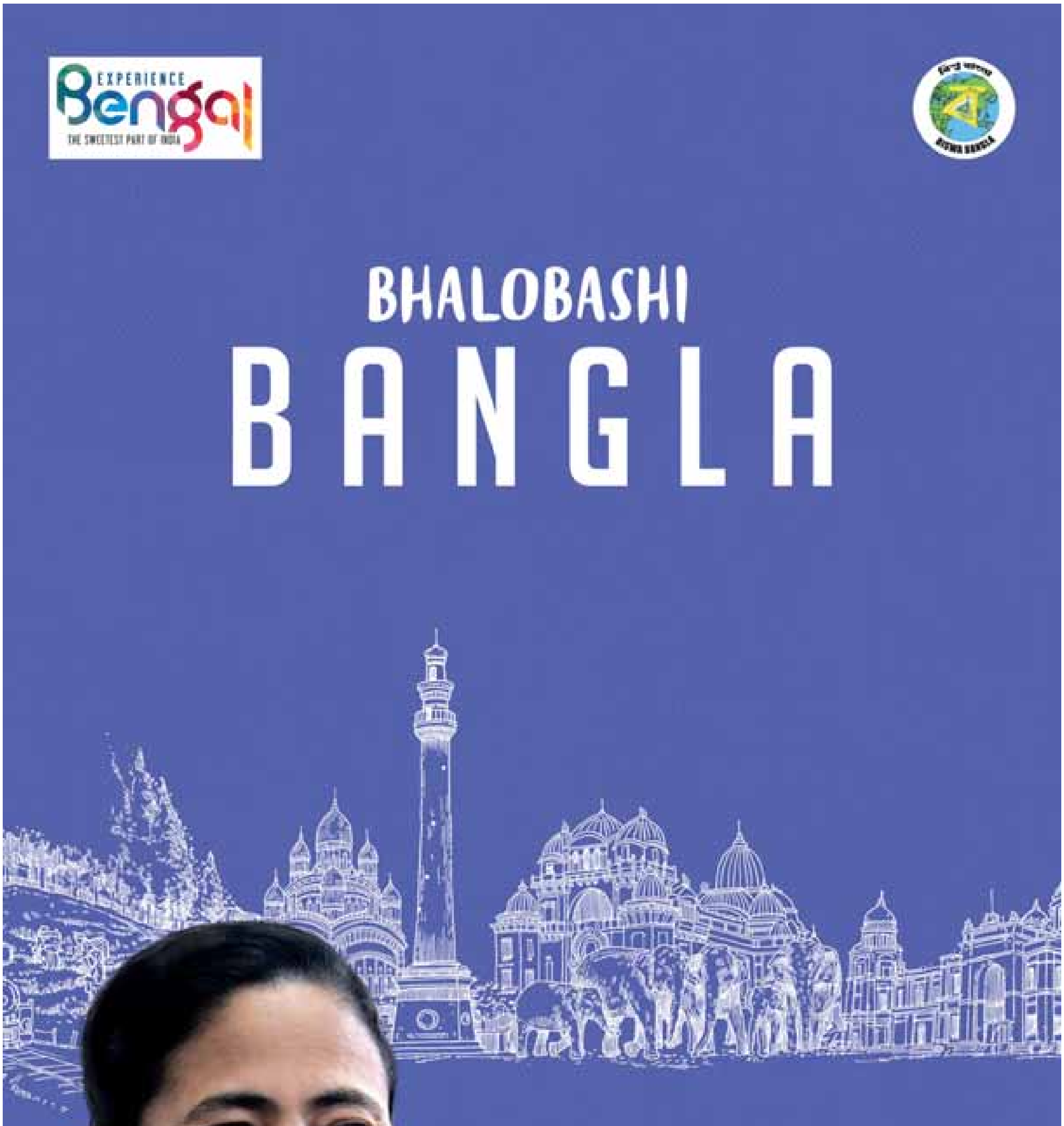

WEST BENGAL TOURISM
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চোখে বাংলা

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-16 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

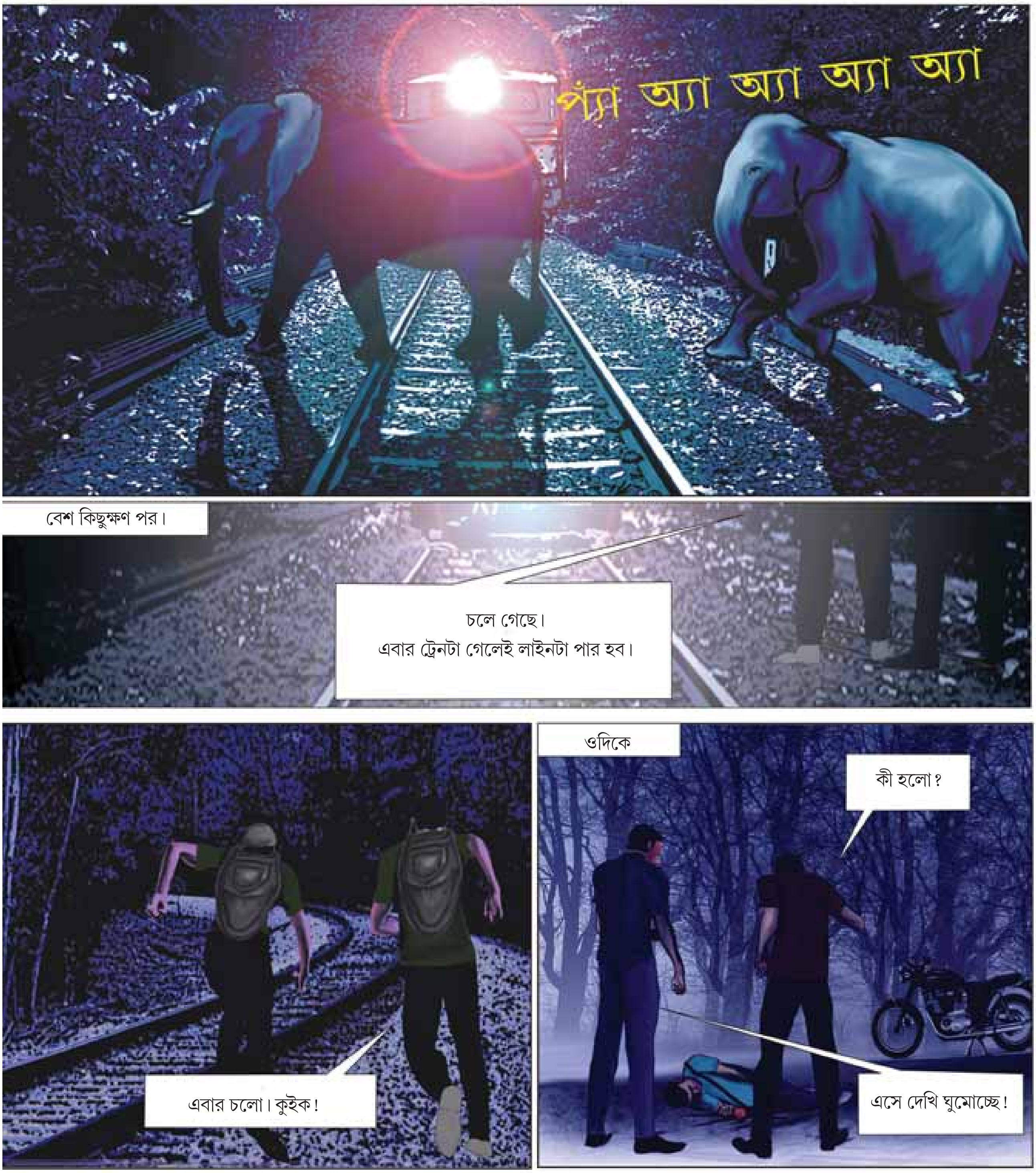

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.